কম্পিউটারের ইতিহাস

খায়রুল আলম মনির

কম্পিউটারের ইতিহাস

খায়রুল আলম মনির

রোদেলা প্রকাশনী

কম্পিউটারের ইতিহাস

খায়রুল আলম মনির

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৯

রোদেলা ১২৮

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অফিস : ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
শিশির আলম

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

Computerer Itihas by Khairul Alam Monir.
First Published 21 Book Fair February 2009
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela_prokashani@yahoo.com

Price : Tk. 100.00 only US $5.00
ISBN : 984 70117 0127 1 Code : 128

উৎসর্গ

তবিব উল আলম খান সুমনকে

সূচিপত্র

কম্পিউটারের প্রাক প্রসঙ্গ	৯
কম্পিউটারের প্রজন্মসমূহ	১৩
হার্ডওয়্যার পরিচয়	১৫
ইনপুট হার্ডওয়্যার পরিচয়	১৬
স্টোরেজ হার্ডওয়্যার	২৬
আউটপুট হার্ডওয়ার	৩২
কম্পিউটারের বাইনারি পদ্ধতি	৩৪
মাল্টিমিডিয়া	৩৮
কম্পিউটারের অন্যান্য তথ্য	৪৪
সফটওয়্যার	৪৭
ইন্টারনেট	৫১
কম্পিউটার গেস	৫৫
কম্পিউটার ভাইরাস	৫৯
কম্পিউটার বিষয়ক শব্দকোষ	৫৯

কম্পিউটারের প্রাক প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানীদের বদ্ধমূল ধারণা মতে, যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৩,৫০০ বছর পূর্বে প্রাচীন ব্যাবিলীয়ানরা বিভিন্ন রেকর্ড সংক্ষণের জন্য ক্লে ট্যাবলেট ব্যবহার করতো। হিসাব-নিকাশের জন্য গণনার কাজে মানুষ নিজের হাতের আঙুল ব্যবহার করেছে। নুড়ি, ছোট ছোট কাঠি, দড়ির গিঁট ইত্যাদি ব্যবহার করে ঠিক রেখেছে হিসাব-নিকাশ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ বছর আগে মানুষ এ্যাবাকাস যন্ত্রের ব্যবহার করে। বলা যায় এটাই প্রথম সংখ্যাভিত্তিক বা ডিজিটাল গণনা যন্ত্র। চীন দেশে প্রথম এ্যাবাকাস যন্ত্র আবিষ্কার হয়। জাপানে এ যন্ত্রের নাম 'সরোজন'। মুলত এ্যাবাকাস হলো আয়তাকার একটা কাঠামো। এর মধ্যে কতগুলো তার আড়াআড়ি বসানো থাকতো। প্রতিটি তার আবার দুটো অংশে ভাগ করা। উপরের অংশে দুটো করে আর নিচের অংশে পাঁচটা করে পুঁতি থাকতো। উপরের প্রত্যেকটি পুঁতির মান ৫ আর নিচের প্রত্যেকটি পুঁতির মান ১। প্রতিটি তার আবার একক, দশক, শতক, হাজার বোঝায়। গণনা কাজে ঠিক সংখ্যার পুঁতি উপরের দিকে ঠেলে দিতে হতো। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি গণিত বিশারদ প্যাসকেল সহজে গণনা করার জন্য 'প্যাসকেলাইন' নামের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ধারণা করা হয়, এটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ক্যালকুলেটর।

এরপর ২০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। ১৮৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ব্যাবেজ যে ধারণা দেন, আধুনিক কম্পিউটার সে অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। তাই চার্লস ব্যাবেজকে 'আধুনিক কম্পিউটারের জনক' বলা হয়। তিনি তার ধারণা

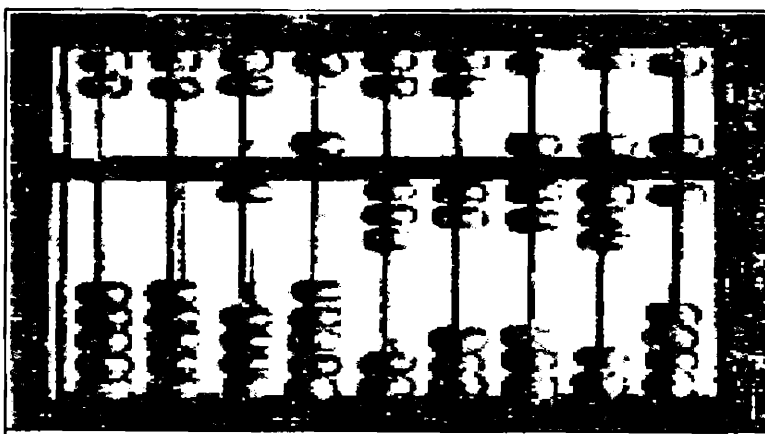

Abacus - অ্যাবাকাস

অ্যালান টিউরিং ড. ভিনসেন্ট অ্যাটান্‌সফ

অনুযায়ী তিনি নিজে কম্পিউটার তৈরি করে যেতে পারেন নি। তবে তা পরবর্তীতে বাস্তবে রূপ লাভ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী অ্যালান টিউরিং আধুনিক কম্পিউটারের গঠন কী রকম হওয়া উচিত, কেন এ রকম হওয়া উচিত, এটির কর্ম ক্ষমতা কত দূর এবং কোথায় এর দুর্বলতা তার একটি সার্থক মডেল তিনি বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরেন। আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের মাঝে টিউরিং-এর মেশিন (Turing Machine) নামে সমধিক প্রচলিত।

অ্যালান টিউরিং-এর কম্পিউটার মডেলের বাস্তব রূপ দিলেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী কনরাড জুস। তিনি আবিষ্কার করেন জেড-ওয়ান (Z-1) নামক প্রথম প্রোগ্রাম চালিত যান্ত্রিক কম্পিউটার। সে বছর প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের আদি রূপ তৈরি হয় ড. ভিনসেন্ট অ্যাটান্‌সফ এবং ক্লিফোর্ড বেরি নামক দুই মার্কিন বিজ্ঞানী কর্তৃক। তাদের নামানুসারে ঐ কম্পিউটারের নাম দেওয়া হয় 'অ্যাটান্‌সফ বেরি কম্পিউটার' সংক্ষেপে (ABC)। ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে জন মস্‌লি নামক এক বিজ্ঞানী (ABC)-কে আরো উন্নত করার জন্য আমেরিকার সামরিক বিভাগের ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আবিষ্কার করলেন 'এনিয়াক' (ENIAC) নামক কম্পিউটার যার ওজন ছিল ৩০টন এবং আকৃতি ছিল ৩টি বিশাল ঘর জুড়ে। এনিয়াক-ই ছিল পৃথিবীর প্রথম পুর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কার হয় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। আর কম্পিউটারের ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হয় ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কম্পিউটার বাজারজাত করা হয়। প্রথম যুগের কম্পিউটার ছিল বিশাল বড়। সেগুলো যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি ছাড়া আর কেউ তা চালাতেই পারতো না। এবাকাস আবিষ্কারের বহু

পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় ঘড়ি। সেই ঘড়ি কিন্তু নিজে নিজে চলতে পারতো না। তাকে চালানোর জন্য সহযোগিতার দরকার হতো। কিন্তু মানুষের আশা যন্ত্র যেন নিজে নিজে চলতে সক্ষম হয়।

১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিজ্ঞানী প্যাসকল আবিষ্কার করেন যোগ বিয়োগ করার একটি যন্ত্র। পাসকলের পিতা ছিলেন একজন সরকারি চাকরিজীবী— তাকে কর আদায়ের হিসাব রাখতে হতো। ওই হিসাব করার ব্যাপারটি কী যে ঝামেলার এবং কষ্টের! বাবাকে ঝামেলামুক্ত করতে প্যাসকল নামলেন গবেষণায়। অবশেষে তিনি আবিষ্কার করেন যোগ বিয়োগের যন্ত্র। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম দিলেন 'প্যাসকালিন'।

যোগ বিয়োগ ছাড়াও আরো অন্যান্য হিসাব করা যায় এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন জার্মান বিজ্ঞানী লাইবনিৎজ।

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ কম্পিউটার আবিষ্কারের একশো বছর আগে কম্পিউটারের মূল সূত্র বর্ণনা করেন। তাই তাকে বলা হয় 'কম্পিউটারের জনক'। তিনি বললেন, যন্ত্রের মাধ্যমে জটিল অংক সহজে করা সম্ভব। তিনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আবিষ্কার করলেন এনালাইটিক্যাল মেশিন। এটিকেই পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার বলা যায়। তাঁর এ কম্পিউটারের ছিল তিনটি অংশ। যথা : ১. স্টোর ও বাণ্ডার, ২. মিল বা কারখানা ও ৩. সিকোয়েন্সিয়াল মেকানিজম বা পর্যায়ক্রমিক যান্ত্রিক কাজ। তাছাড়া ব্যাবেজের যন্ত্রে ছিল স্মৃতি। ১০০টি সংখ্যা এতে জমা থাকতো। এর ১০০ বছর পর হাওয়ার্ড এইকেন যে আধুনিক কম্পিউটার তৈরি করেন তারও ছিল তিনটি উপাদান। যথা : ১. ম্যাগনেটিক কোর, ২. রেজিস্টার ও ৩. প্রোগ্রাম। তিনি এটি করেছিলেন ব্যাবেজকে অনুসরণ করে। ব্যাবেজের ছাত্রী কবি বায়রনের কন্যা এডা

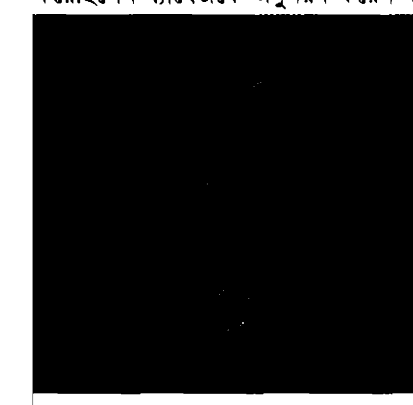

ব্লেইজ প্যাসকেল

চার্লস ব্যারেজ

বায়রন ব্যাবেজ আবিষ্কৃত কম্পিউটারের জন্য কিছু নির্দেশ রচনা করেন। তাই তাকে 'পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রামার' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

অবশ্য কম্পিউটারের ইতিহাসে এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন হার্মেন হলারিথ। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর দেশের লোক গণনা করার নিয়ম। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে লোক গণনার কাজ শুরু করে তা ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দেও শেষ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের গণনায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যন্ত্রের সাহায্যে লোক গণনার ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু তেমন যন্ত্র তো থাকা দরকার।

২৫ বছর বয়সের পরিসংখ্যানবিদ হলারিথ আবিষ্কার করেন তেমনি একটি যন্ত্র। নাম দেন 'সেন্সাস মেশিন'। এটি বিশ্বের প্রথম ডাটা প্রসেসিং যন্ত্র। এ যন্ত্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বুঝে হলারিথ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ট্যাবুলেটিং মেশিন কোম্পানি গঠন করেন। এটি সহ অন্য কয়েকটি কোম্পানিকে একত্রিত করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে আই.বি.এম. প্রতিষ্ঠা করা যায়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাওয়ার্ড এইকেন স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরির কাজে হাত দেন। সে দেশের নৌবাহিনী তাঁকে এ কাজে সহায়তা করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কম্পিউটার 'সার্ফ-১'-এর কাজ সমাপ্ত করতে সমর্থ হন।

তবে এই কম্পিউটারটি দৈর্ঘ্য ছিল ৫১ ফুট, উচ্চতা ৮ ফুট। প্রোগ্রামিংয়ের জন্য এতে ছিদ্র করা টেপ ব্যবহার করা হয়েছিল। ভেতরের কাজ ছিল ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক্যালি বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়। এ কম্পিউটারের কোনো স্মৃতি ছিল না। আর তাই এটি দ্বারা কোনো তথ্য জমা করে রাখা যেত না।

প্রথম যে ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার তৈরি হলো তার নাম 'এনিয়াক'। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি তৈরি করেন জে প্রেসপার একার্ট জুনিয়র এবং জন ডব্লিউ মকলিকে। মকলিকে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছাত্র একার্ট জন সঙ্গে নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় এনিয়াক তৈরি করেন। 'মার্ক- ১' এর চেয়ে এনিয়াক আকারে বেশ ছোট ছিল।

এনিয়াকের ওজন ৩০ টন বা ২৭ হাজার কেজি। দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট। ১৫০০ বর্গফুট জায়গার দরকার হয়েছিল এটি স্থাপন করতে এর মধ্যে ছিল প্রায় ১৮ হাজার ভ্যাকুয়াম টিউব। প্রতিদিন অন্তত দু হাজার ভ্যাকুয়াম টিউব নষ্ট হয়ে যেত। আর মেশিন চালু রাখার জন্য তা প্রতি মাসেই বদলাতে হতো। এজন্য ৬ জন কর্মী সব সময় নিয়োজিত থাকতো। এনিয়াক প্রত্যেক সেকেণ্ডে ৫ হাজার সংখ্যা যোগ করতে সক্ষম ছিল।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জন ভন নিউম্যান এক গবেষণাপত্রে কম্পিউটারে প্রোগামিংয়ের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আগে প্রোগ্রামিংয়ের কাজ করা হতো তারের সংযোগ খুলে। প্রতিবারে ভিন্নভাবে লাগাতে হতো। মকলি ও একটি জন ভন নিউম্যানের ধারণার ওপর নির্ভর করে তৈরি করেন এডভাক। এটি অবশ্য পুরোপুরি মেমোরি নির্ভর নয়। পুরো মেমোরি নির্ভর কম্পিউটার এডসাক তৈরি হয় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এটি আবিষ্কার করেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে মকলি ও একার্ট কম্পিউটার ইউনিভাক তৈরি করেন। এ কম্পিউটারটি প্রথম কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ইউনিভাক-১' কিনে নেয় অ্যাপ্লায়েন্স পার্ক নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ট্রান্সিস্টর আবিষ্কার হয়। এটি বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি মাধ্যম। কম্পিউটারের উন্নতিতে এই ট্রান্সিস্টরের বিশেষ অবদান রয়েছে। ট্রান্সিস্টরের সুবিধার পাশাপাশি ছিল বেশ কিছু অসুবিধা। এটি খুব সহজে ভেঙ্গে যেত। প্রায় বোর্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতো। তখন বিকল হয়ে পড়তো কম্পিউটার। ওই সমস্যার সমাধান করতে বিজ্ঞানীরা ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে তারা তৈরি করেন আই.সি. বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। এর ঠিক ১০ বছর পর কম্পিউটার প্রযুক্তির আরো উন্নতি হলো। তৈরি হলো 'মাইক্রো প্রসেসর'। বর্তমানের একেকটি মাইক্রোপ্রসেসরে ১ কোটির উপরে ট্রান্সিস্টর রয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর আকারও অনেক কমেছে। আগে যা স্থাপন করতে বিশাল জায়গার দরকার হতো এক সময় তা আকারে ছোট হতে হতে টেবিলের কোণায় কিংবা হাতে বহন করার মতো রূপ নিয়েছে। আর এর গতি বা প্রসেসিং ক্ষমতাও বেড়েছে বিস্ময়কর ধরনের।

কম্পিউটারের প্রজন্মসমূহ

কম্পিউটারের প্রথম প্রজন্ম

আমাদের এই বিস্ময়কর কম্পিউটারের ইতিহাসকে প্রজন্ম দিয়ে ভাগ করলে প্রথম প্রজন্মের মেয়াদ ধরা হয় ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ের কম্পিউটার কেমন ছিল তা সংক্ষেপে বললে এরকম : ১. ডাটা ঢোকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে পাঞ্চ কার্ড। ২. ডাটা ধারনের জন্য ম্যাগনেটিক টেপ। ৩. ভ্যাকুয়াম টিউব নির্ভর

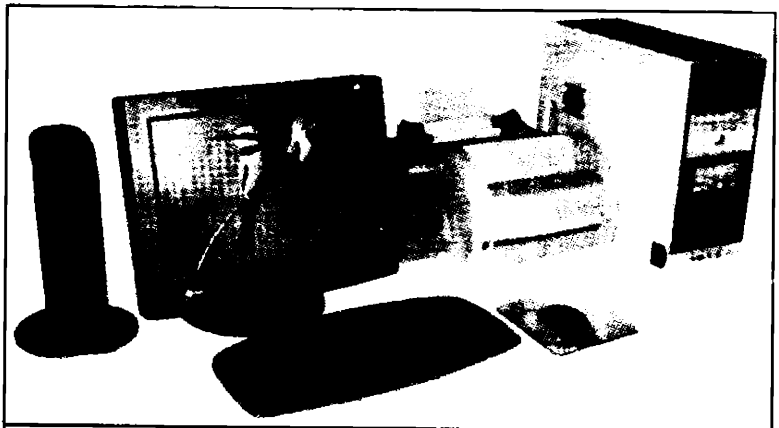

Personal Computer - পারসোনাল কম্পিউটার

মেমোরি। তাছাড়া কোনো কোনোটিতে মেমোরির জন্য ড্রাম ব্যবহৃত হয়েছে। ৪. কম্পিউটারের গতি ছিল খুবই ধীর। ৫. একবারের মাত্র একটি প্রোগ্রাম চালানো যেত। ৬. 'মার্ক-টু', 'এনিয়াক', 'এডসাক', 'এডভাক ইউনিভাক' ইত্যাদি এ জন্মের কম্পিউটার। ৭. দাম ছিল একেবারে আকাশ ছোঁয়া। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ইউনিভাক কম্পিউটারের দাম ছিল ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার। ৮. প্রতিটি কম্পিউটার ছিল খুব বিশাল আকারের। ৯. রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ছিল কল্পনাতীত।

কম্পিউটারের দ্বিতীয় প্রজন্ম

কম্পিউটারের দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়াদ ধরা হয় ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়কার কম্পিউটার হলো : ১. ভ্যাকুয়াম টিউবের বিদায় এবং তার জায়গায় ট্রান্সিস্টরের আগমন। ২. মেমোরি হিসেবে তৈরি হয় ম্যাগনেটিক কোর। ৩. তথ্য ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় অপসারণযোগ্য ডিস্ক। ৪. কম্পিউটারের আকার ছোট হয়েছে, গতি বেড়েছে এবং দাম অনেক কমেছে। ৫. উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষার ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পায়।

কম্পিউটারের তৃতীয় প্রজন্ম

তৃতীয় প্রজন্মের মেয়াদ হলো ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৩৬০/মেইনফ্রেম সিস্টেম আই.বি.এম. পরিবারে প্রবর্তনের সঙ্গে এ প্রজন্মের আরম্ভ মোটামুটিভাবে এ সময়ে কম্পিউটারের যে রূপ ধরা পড়ে তা হলো : ১. আইসি'র ব্যবহার। ২. ডাটা ধারণের জন্য ম্যাগনেটিক ডিস্কের ব্যবহার শুরু। ৩. মাল্টি প্রোগ্রামিং বা একসঙ্গে কয়েকটি প্রোগ্রামিং করার সুযোগ। ৪. ১৯৭০ এ মিনি কম্পিউটার চালু। ৫. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার আলাদা আলাদাভাবে বিক্রি সিদ্ধান্ত হয়। ফলে সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ ঘটে ব্যাপক হারে।

কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্ম

কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্ম হিসেবে ১৯৭১ থেকে চলমান সময়কে ধরা হয়। এ সময়ে কম্পিউটারের উন্নতি সাধিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। যেমন : ১. ১৯৭১ এ টেড হফ মাইক্রোপ্রসেসরের উদ্ভাবন। ২. তথ্য প্রযুক্তির অনেক উন্নয়ন। ৩. মাইক্রোপ্রসেসরে সম্পূর্ণ একটি সি.পি.ইউ. একটি চিপে আটকানো হয়। ৪. ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এ্যাপল কম্পিউটার এবং ১৯৮৩-তে এপল ম্যাকিনটোশ বাজারে আসে। ৫. ১৯৮১-তে আই.বি.এম পিসির আর্বিভাব। ৬. সফটওয়্যারের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন। ৭. বিস্ময়কর আবিষ্কার ইন্টারনেটের সংযোজন। ৮. কম্পিউটারের আকার অনেক ছোট হয়। কার্যক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। দাম সাধারণের হাতের নাগালে থাকে।

হার্ডওয়্যার পরিচয়

একটি কম্পিউটারের যা দৃশ্যমান অর্থ্যাৎ দেখা যায় এরকম যন্ত্র ও যন্ত্রাংশই হার্ডওয়্যার। আর দেখা যায় না অথচ অন্তরালে থেকে কম্পিউটারকে চালায় তাই সফটওয়্যার।

একটা কী-বোর্ড, মনিটর, সিস্টেম ইউনিট ন্যূনতম এই কয়টি হার্ডওয়্যার সামগ্রী যুক্ত করে কম্পিউটার থেকে আমরা কাজ পেতে পারি। কম্পিউটারকে মাল্টি পারপাজে ব্যবহার করতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংযোজন করতে হয়। এ কারণে শুধু প্রসেসর ইউনিটকে কম্পিউটার বললে অন্যান্য হার্ডওয়্যারগুলোকে 'পেরিফেরাল' হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

যেসব হার্ডওয়ারের সমন্বয়ে কম্পিউটারের সিস্টেম তৈরি হয়, সেগুলোর প্রকৃতি অনুসারে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ইনপুট হার্ডওয়্যার, ২. প্রসেসিং হার্ডওয়্যার, ৩. স্টোরেজ হার্ডওয়্যার ৪. আউটপুট হার্ডওয়্যার ও ৫. কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের হার্ডওয়্যার।

ইনপুট হার্ডওয়্যার ‖ Input Hardware

বলা যেতে পারে ময়দার মিলে গম নিয়ে গেলে তা প্রসেসিং-এর মাধ্যমে ময়দায় রূপান্তরিত করা হয়। এখানে গম হলো 'ইনপুট' বা উপকরণ। আর ময়দা হলো 'আউটপুট'। গম থেকে ময়দা হতে যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তা করে ফ্লাওয়ার মিল। একইভাবে কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়াকরণের কাজ কম্পিউটার করবে। তবে আমরা যা করতে চাই প্রথমে তা ইনপুটের মাধ্যমে কম্পিউটারকে জানাতে হবে। তবেই কম্পিউটার গাধার মতো সেই কাজটি করে যাবে। কিন্তু কম্পিউটার তো আর আমাদের ভাষা বোঝে না। তার রয়েছে যান্ত্রিক ভাষা। তাই আমাদের ভাষা যেমন A B C D, ক

ক্লিফোর্ড বেরি

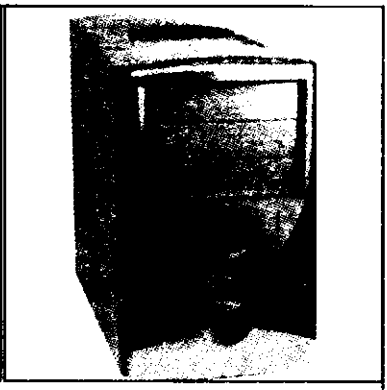

CPU - সি পি ইউ

খ গ ঘ অথবা ১ ২ ৩ ৫ ইত্যাদির রূপান্তর করেই কম্পিউটারে ইনপুট করতে হবে। কম্পিউটারে কোনো কিছু ইনপুটের প্রধান মাধ্যমে হলো কী বোর্ড। এছাড়া ইনপুট দেওয়ার জন্য 'মাউস', 'টাস প্যাড', 'জয়স্টিক', 'স্ক্যানার' ইত্যাদি রয়েছে। এসব যন্ত্রকে একসঙ্গে 'ইনপুট হার্ডওয়্যার' বলে। ইনপুট হার্ডওয়্যারকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. বোর্ড এন্টি ও ২. ডাইরেক্ট এন্ট্রি। ইনপুট হার্ডওয়্যারের যন্ত্রাংশের মধ্যে রয়েছে : ১. কী বোর্ড, ২. মাউস, ৩. টার্মিনাল, ৪. জয়স্টিক, ৫. ট্র্যাক বল, ৬. টাচ প্যাড, ৭. লাইট পেন, ৮. টাচ স্ক্রিন, ৯. গেম প্যাড, ১০. স্ক্যানার, ১১. বারকোড রিডার, ১২. অপটিক্যাল রিডার, (ক) ও.সি.আর (খ) ও.এম.আর, ১৩. ডিজিটাইজিং টেবলেট, ১৪. স্মার্টকার্ড, ১৫. মাইক্রোফোন, ১৬. ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ১৭. ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি।

ইনপুট হার্ডওয়্যার পরিচয়

কী বোর্ড। Key Board

'কী' শব্দের অর্থ চাবি। সাধারণত টাইপরাইটারের মতো ইংরেজি অক্ষর এবং বিশেষ কিছু চিহ্ন সারি সারি করে সাজানো থাকে একটি বোর্ডে। কী বোর্ডের ভেতর আছে একটি সার্কিট বোর্ড এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। কোনো একটি কীতে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি বিশেষ নির্দেশ বা বোর্ড তৈরি করে। তারপর কোড রচিত হয় যন্ত্রের ভাষায়। কী বোর্ডের তারের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেত সিস্টেম ইউনিটে বা প্রসেসিং হার্ডওয়্যারে চলে যায়। ইংরেজি বর্ণগুলো ছাড়াও কী-বোর্ডে থাকে অনেকগুলো বিশেষ ধরনের কী। যেমন : 'কন্ট্রোল কী', 'এন্টার কী', 'অলটার কী', 'ফাংশন কী' প্রভৃতি।

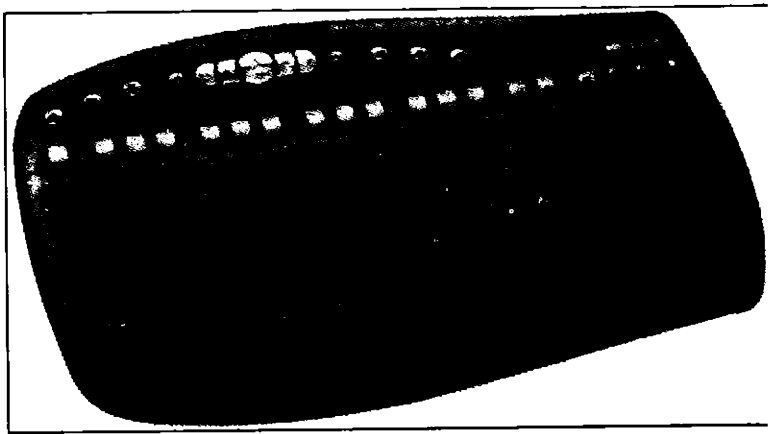

Key Board - কি বোর্ড

উইন্ডোজের জন্য ব্যবহৃত কী-বোর্ডে ১৯৪টি কী রয়েছে। এতে স্টার্ট মেনু খোলার জন্য দুদিকে দুটি এবং কনটেক্সট মেনু খেলার জন্য আছে একটি কী। ওই জাতীয় কী-বোর্ডই বর্তমানে চালু রয়েছে। ওই কী-বোর্ডে আছে 'কন্ট্রোল', 'অলট', 'ট্যাব', 'ব্যাকস্পেস', 'এসকেপ', 'ইনসার্ট', 'হোম', 'এন্ড' প্রভৃতি।

কী-বোর্ডে চারটি এ্যারো কী আছে। এগুলোর গায়ে তীর চিহ্ন রয়েছে। কার্সরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কী ব্যবহৃত হয়। এ্যারো কী'র সাহায্যে ওপরে, নিচে, ডানে, বামে কার্সারকে নেওয়া যায় অতি সহজে।

কী বোর্ডের ওপরের সারিতে রয়েছে ফাংশন কী। বিভিন্ন সফটওয়্যারে ফাংশন কীর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে। সম্প্রতি কী বোর্ডের বাংলা অক্ষর চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে বোঝা খুব সহজ হয়।

মাউস I Mouse

এটি একটি প্রাণীর নাম। 'মাউস' শব্দের অর্থ ইঁদুর। এটি দেখতে আসলে অনেকটা ইঁদুরের মতো। তাই হয়তো এর নাম রাখা হয়েছে 'মাউস'। একটি তারের সাহায্যে সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত থাকে ওটি। একটি সমতল প্যাডের ওপর মাউসকে রাখা হয়। প্রতিটি মাউসে দুই বা তিনটি বাটন থাকে। আর থাকে একটি ট্র্যাকিং বল। মনিটরে মাউসের একটি চিহ্ন মুভ করে, এটিকে বলে 'পয়েন্টার'। মাউস মুভ করানোর সঙ্গে সঙ্গে মনিটরে পয়েন্টার ডিভাইসটিও নড়াচড়া করে, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। সাধারণত পয়েন্টার দেখতে তীরের মতো। তবে কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কখনো মুষ্টিবদ্ধ হাত, কখনো তর্জনি, কখনো মাছির মতো।

মাউসের বাটন চেপে ধরে রেখে কম্পিউটার ব্যবহারকারী কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট বা চিহ্নিত করতে হয়। কোনো লেখাকে সিলেক্ট করতে হলে মাউসের বাটন

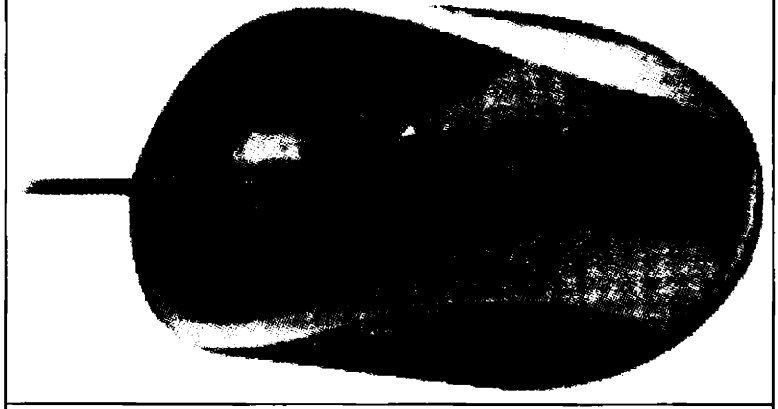

Mouse - মাউস

চেপে ধরে তারপর ছেড়ে দিয়ে কোনো অংশকে চিহ্নিত করা হয়। এ অবস্থাকেই 'সিলেক্ট' বলে। সিলেক্ট করা অংশকে বাটনচেপে ধরে টেনে নেওয়াকে বলে 'ড্রাগ'। আর সিলেক্ট করা অংশকে কোনো জায়গায় নিয়ে মাউসের বাটন ছেড়ে দেওয়াকে বলে 'ড্রপ' করা। এমন অনেক কাজ আছে যা কী বোর্ডের সাহায্যে সম্পন্ন করতে অনেক সমস্যা হয়। তাই ওগুলো মাউসের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

টার্মিনাল। Terminal

মাইক্রো কম্পিউটারে সম্পূর্ণ কম্পিউটারটিই ব্যবহারকারী চোখের সামনে থাকে। কিন্তু মিনি বা মেইনফ্রেম কম্পিউটারের বেলায় তা হয় না। এসব কম্পিউটারের ইনপুট হার্ডওয়্যার হিসেবে টার্মিনাল ব্যবহৃত হয়। টার্মিনাল তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১। ডাম্ব টার্মিনাল, ২। স্মার্ট টার্মিনাল, ৩। ইন্টেলিজেন্ট টার্মিনাল। শুধু ডাটা আদান-প্রদানের জন্য ডাম্ব টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়। স্মার্ট টার্মিনালে ডাটা পড়া যায় এবং এর যথাযথ পরীক্ষা করা যায়। আর ইন্টেলিজেন্ট টার্মিনাল একটি মাইক্রো কম্পিউটার এটিকে কোনো সময় পৃথক পৃথকভাবে টার্মিনাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।

ট্রাক বল। Track Ball

কম্পিউটারে একটা সাধারণ মাউসকে যদি আমরা উল্টো করে ধরি তবে দেখতে পাবো একটি বল রয়েছে পেছন দিকটায়। ট্রাক বল কিন্তু এ রকমই। যে কম্পিউটার বহন করা হয় সেই সমস্ত কম্পিউটারে ট্রাক বল ব্যবহৃত হয়। মাউসের মতো এটিকে নাড়াচাড়া করতে হয় না। শুধু আঙুল দিয়ে ট্রাক বলকে নাড়ালেই পয়েন্টার কাজ করে যায় অবিরামভাবে।

জয়স্টিক। Joystick

জয়স্টিক দেখতে অনেকটা উড়োজাহাজের গিয়ারের মতো, হ্যান্ডেল ধরনের। এটি সামনে পেছনে নাড়ানো যায়। দু পাশে ড্রাইভ করা যায়। এ ধরনের হ্যান্ডেলের নামই জয়স্টিক। ভিডিও গেম খেলার জন্য জয়স্টিক ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারকে দ্রুত কোনো নির্দেশ দেওয়ার জন্য জয়স্টিক খুবই কার্যকরী। এত দ্রুত কী বোর্ড বা মাউসের মাধ্যমে কম্পিউটারকে কোনো নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় না।

টাচ প্যাড। Touch Pad

কিছু কিছু ল্যাপটপে ট্রাক বলের বদলে টাচ প্যাড ব্যবহার করা হয়। টাচ প্যাডের নিচের দিকে আছে দুটি বাটন। প্যাডে হাত দিয়ে পয়েন্টারকে প্রয়োজন মতো জায়গায় নিয়ে বাটনগুলো ক্লিক করলে মাউসের মতো কাজ করে।

গেম প্যাড I Game Pad

ভিডিও গেমের সহযোগী ইনপুট মাধ্যম হিসেবে গেম প্যাড ব্যবহৃত হয়। গেম প্যাডে ৪টি এ্যারো কী থাকে এবং জয়স্টিকের মতো একটি ছোট হ্যান্ডেলও থাকে। খুব অল্প জায়গায় একসঙ্গে এতোগুলো কী থাকে বলে গেম প্যাডের মাধ্যমে খেলার সুবিধা হয় অনেক।

লাইট পেন I Light Pen

কলমের মতো দেখতে লাইট পেন একটি আলোক সংবেদনশীল যন্ত্র। গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীরা লাইট পেনের মাধ্যমে কম্পিউটারে কাজ করে থাকেন। এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি।

স্ক্যানার I Scanner

আমাদের মানুষের সাধারণ ভাষা কম্পিউটার পড়তে না পারলেও ছবির ভাষা ঠিকই পড়তে পারে। তবে ছবির সাধারণ অবস্থাকে ডিজিটাল রূপান্তর করেই কম্পিউটার তা বুঝতে পারে। এ কাজটি করতে কম্পিউটারে ইনপুট হার্ডওয়্যার হিসেবে ব্যবহৃত হয় স্ক্যানার। ফটোগ্রাফ, ছবি, লোগো ইত্যাদিকে পিক্সেলে পরিবর্তন করে ইমেজ তৈরি করার কাজটি স্ক্যানার করে থাকে। স্ক্যানারে সাধারণত দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় . যথা : ১. সি.সি.ডি বা চার্জড কাপল ডিভাইস এবং ২. ড্রাম প্রযুক্তি।

সি.সি.ডি অনেকটা ফটোকপি মেশিনের মতো। এই প্রযুক্তিকে কোনো ইমেজের ওপর তীব্র আলো ফেলা হয়। আর আলোগুলোর মাধ্যমে তৈরি বিভিন্ন বিন্দুকে বিশ্লেষণ করে ছবির রং ও ছায়াকে বৈদ্যুতিক মান প্রদান করে। তার থেকেই

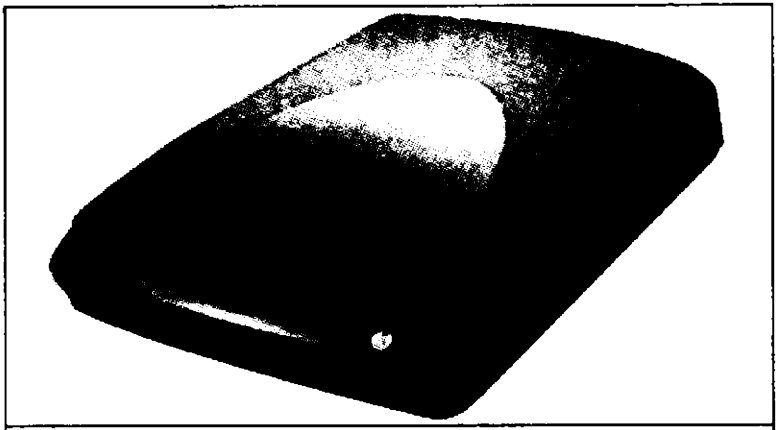

Scanner - স্ক্যানার

বাইনারি ডাটা বা বিট হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন বিট বিভিন্ন রংয়ের ছায়াকে দেখায়। কোনো ছবি থেকে যদি অধিক ডাটা সংগ্রহ করতে পারে স্ক্যানার তবেই ছবির মান তত ভালো আসে। বাজারে কয়েক ধরনের স্ক্যানার রয়েছে। যেমন : হ্যান্ড হেল্ড। ফ্লাট বেড বা শিট ফেড স্ক্যানার দুটোই পিসির সঙ্গে বেশি ব্যবহৃত হয়। ফ্লাড বেড স্ক্যানার একদম ফটোকপির মতো। ফটোকপিকে যেমন ছবিকে কাঁচের ওপর রাখতে হয় এতেও সে রকম কাঁচের ওপর রাখার পর তার ওপর দিয়ে বিশেষ আলো ফেলে স্ক্যানের কাজ সম্পন্ন হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর মাধ্যমে করা হয়।

বারকোড রিডার। Bar Code Reader

আমরা সচরাচর কোনো আমদানী করা পণ্য বা রফতানিযোগ্য পণ্যের প্যাকেটে পাশাপাশি বেশ কিছু কালো দাগ দেখতে পাই। এ দাগের নিচ দিয়ে কয়েকটি সংখ্যাও লেখা থাকে। এটা আসলে এক প্রকারের সাংকেতিক লেখা। একে বলে 'বারকোড'। এই বারকোর্ডের লেখা বারকোড রিডারের মাধ্যমে কম্পিউটার পড়তে পারে। আর তা থেকেই পণ্যের নাম দাম, মজুত, উৎপাদনের তারিখ, ইত্যাদি জানা যায়। বারকোড রিডার অনেকটা স্ক্যানারের মতোই কাজ করে। এই জাতীয় হার্ডওয়্যারকে একসঙ্গে 'স্ক্যানিং ডিভাইস' নামে অভিহিত করা হয়।

অপটিকাল রিভার। Optical River

বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ, পরীক্ষার সময় খাতায় রোল, কেন্দ্র, বিষয় ইত্যাদি পরিচয় লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে কারো অজানা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তাকার ঘরকে পেনসিল দিয়ে পূরণ করার পর সেগুলো কম্পিউটারের প্রক্রিয়া করা হয়। এটি একটি সুন্দর প্রক্রিয়া।

প্রসেসিং হার্ডওয়্যার। Processing Hardware

সাধারণত সিস্টেম ইউনিটের ভেতরের হার্ডওয়্যারগুলোকে 'প্রসেসিং হার্ডওয়্যার' বলে। এই হার্ডওয়্যারের কাজ হলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পাওয়া নির্দেশগুলোকে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা করা। সি.পি.ইউ, মাদারবোর্ড, সিস্টেম ক্লক, র‍্যামচিপ, রম চিপ, ফ্ল্যাশ রম, এক্সপানশন বোর্ড ও স্লট, পোর্ট, ডি-র‍্যাম ইত্যাদি প্রসেসিং হার্ডওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত।

সি.পি.ইউ। C.P.U.

সি.পি.ইউ-এর পুরো অর্থ হলো 'সেন্ট্রাল প্রসেসর ইউনিট'। সচরাচর সিস্টেম ইউনিট হিসেবে কম্পিউটারের পুরো বাক্সটাকেই সি.পি.ইউ বলে উল্লেখ করা হয়। সি.পি.ইউ'কে 'মাইক্রো প্রসেসর'ও বলা হয়।

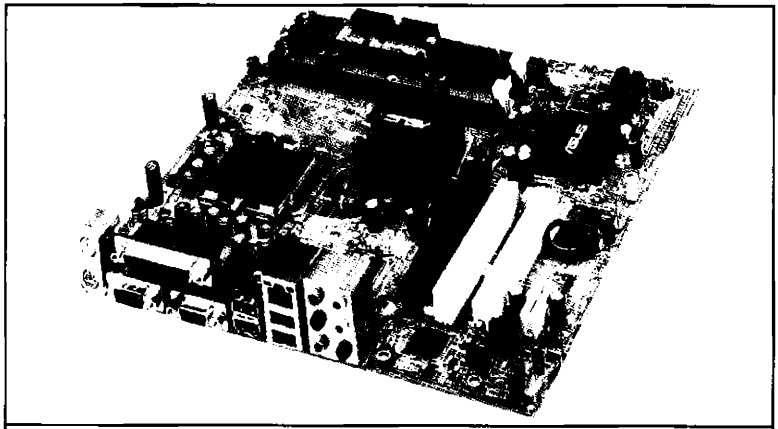

Mother Board - মাদার বোর্ড

পেন্টিয়াম-টু, পেন্টিয়াম-থ্রি এভাবে আমরা কম্পিউটারের নাম বলে থাকলেও এটা কিন্তু আসলে মাইক্রো প্রসেসরের একটি নাম। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো প্রসেসরের চিপ তৈরি করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন চিপকে একই ধরনের কাজের জন্য তৈরি করা যায়। পিসিতে দুই ধরনের স্থাপত্যের প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। আর সেই অনুযায়ীই কম্পিউটারকে 'অ্যাপল' ও 'আই.বি.এম' বলা হয়ে থাকে। আই.বি.এম. কম্প্যাটিবল বা আই.বি.এম. গোত্রের কম্পিউটারকে 'আই.বি.এম.' বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার কম্পিউটারকে 'আই.বি.এম ক্লোন'ও বলা হয়। আই.বি.এম. পিসি'তে ৮০৮৬ ধরনের চিপ ব্যবহৃত হয়। আই.বি.এম. পিসি'তে ইন্টেল এ.এম.ডি ও সাইরাস নামক কোম্পানির চিপ ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন সময় চিপের উন্নতি সাধিত হয়। ৮০২৮৬, ৮০৩৮৬, ৮০৪৮৬ ইত্যাদি নামের চিপ বাজারে আসে। সাধারণ মানুষ সংক্ষেপে এগুলোকে ২৮৬, ৩৮৬, ৪৮৬ নামে জানতো। ইন্টেল কোম্পানি পরবর্তী সময়ে তাদের চিপের নাম সংখ্যার বদলে পেন্টিয়াম নামে বাজারে ছাড়ে। ৮০৬৮৬ কে পেন্টিয়াম-টু তারপর পেন্টিয়াম-থ্রি এরকম।

অ্যাপেলের তৈরি কম্পিউটারের বাণিজ্যিক নাম 'ম্যাক' (Mac)। এই প্রকারের কম্পিউটারের মটোরলা কম্পিউটারের প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মটোরলা ৬৮,০০০ চিপ তৈরি করে এটি ম্যাক কম্পিউটারের ব্যবহৃত হয়। তারপর তারা ৬৮,০০০ চিপ তৈরি করে। এটি ম্যাক কম্পিউটারের ব্যবহৃত হয়। তারপর তারা ৬৮০২০, ৬৮০৩০, ৬৮০৪০ ইত্যাদি চিপ, বাজারে আনে। অ্যাপেলে 'পাওয়ার পিসি' নামে একটি জনপ্রিয় চিপ ব্যবহৃত হয়।

সি.পি.ইউ. হচ্ছে কম্পিউটারের প্রাণ। এই সি.পি.ইউ'ই মূলত কম্পিউটারকে পরিচালনা করে। সফটওয়্যার থেকে যে রকম নির্দেশ পায় সি.পি.ইউ. সে রকম

কাজ সম্পাদন করে থাকে। সি.পি.ইউ'র রয়েছে দুটি অংশ। যথা : ১। কন্ট্রোল ইউনিট এবং ২। এরিথমেটিক বা লজিক ইউনিট। সি.পি.ইউ'র সব কাজের সমন্বয় করে কন্ট্রোল ইউনিট। কম্পিউটারের অন্য সব যন্ত্রাংশকে কোন্ সময় কী করতে হবে তা বলে দেয়। মূল মেমোরি এবং এরিথমেটিক/লজিক ইউনিটের মধ্যে কীভাবে বৈদ্যুতিক সংকেত বিনিময় হবে তা টিক করে দেয়। এরিথমেটিক/ লজিক ইউনিটের কাজ হলো অংক কষে যুক্তিযুক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে দেওয়া। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ওইসব কাজ এরিথমেটিক ইউনিট করে থাকে। আর কাজগুলো যৌক্তিক কিনা। দুটি ডাটা নিয়ে একটি আরেকটির সমান কিনা ছোট অথবা বড় কিনা সেসব পরীক্ষা করে সেগুলোর পরিমাপ ও তুলনা করে থাকে।

কন্ট্রোল ইউনট এবং এরিথমেটিক/লজিক ইউনিটে থাকে রেজিস্টার। র‍্যাম থেকে ডাটা রেজিস্টারে রাখা হয় সেখানে কাজ শেষ হওয়ার পর আবার র‍্যামে নিয়ে রাখা হয়। সি.পি.ইড. যেভাবে কাজ করে তা হলো : ১. প্রথমে বাইরের মেমোরি থেকে ডাটা এবং নির্দেশনা সংগ্রহ করে। ২. নিজস্ব মেমোরি সার্কিটের ডাটা এবং বাইরের ডাটা ও নির্দেশ দিয়ে গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজগুলো করে। ৩. এবার সেগুলো রেখে দেয় আসল মেমোরিতে।

র‍্যাম I RAM

কম্পিউটারে স্মৃতি বলে একটা কথা আছে। আর স্মৃতি হচ্ছে এর র‍্যাম। এই র‍্যাম গঠিত হয় সিলিকন চিপ দিয়ে। কম্পিউটার দীর্ঘ সময় বিভিন্ন ধরনের ডাটা ও নির্দেশ সংগ্রহ করে। এগুলোর কোনোটি তখনই এবং কোনোটি পরে প্রয়োজন মতো ব্যবহারের জন্য জমা রাখার কাজটি করে র‍্যাম। 'স্মৃতির' ইংরেজি শব্দটি

RAM - র‍্যাম

'মেমোরি'। কম্পিউটারে মেমোরি দুই ধরনের। যথা : ১। প্রাইমারি মেমোরি ও ২। সেকেন্ডারি মেমোরি। এই দু প্রকারের মেমোরিকে অন্যভাবে বলা হয় : ১। ইন্টার্নাল মেমোরি বা ইন্টার্নাল স্টোরেজ, ২। এক্সটার্নাল মেমোরি বা এক্সটার্নাল স্টোরেজ। প্রাইমারি মেমোরি আবার দুই ধরনের। যথা : ১। র‍্যাম এবং ২। রম। এখানে 'র‍্যাম' হলো 'র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরি' আর 'রম' হলো 'রিড ওনলি মেমোরি'। র‍্যামকে পড়া যায় এবং বদলানো যায়। আর রমকে শুধু পড়া যায় কিন্তু বদলানো যায় না। রমের চিপে স্থায়ীভাবে লেখা থাকে।

ডাটা ও নির্দেশ নিয়ে সি.পি.ইউ. কাজ করে। এসব ডাটা ও নির্দেশ প্রথমে র‍্যামে জমা হয়। এখানে ডাটা দ্রুত লেখা হয়। তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হয় অন্যান্য স্থানে এরপর মোছা হয় এবং আবার লেখা হয়। কম্পিউটারে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় মেমোরি বা স্মৃতি তাৎক্ষণিকভাবে কম্পিউটারের র‍্যাম থেকে আসে। যথা : ১. এস-র‍্যাম ও ২. ডি-র‍্যাম। এস-র‍্যাম হলো স্ট্যাটিক র‍্যাম আর-ডি-র‍্যাম হলো ডাইনামিক র‍্যাম।

ডি-র‍্যাম একটি সার্কিটে একটি ট্রান্সস্টর এবং একটি ক্যাপাসিটর থাকে। এখানে ট্রান্সিস্টর সুইসের মতো কাজ করে আর ক্যাপাসিটর বৈদ্যুতিক চার্জ জমা রাখে। ডি-র‍্যাম। ডি-র‍্যাম কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন এক্সটেন্ডেড ডাটা আউট র‍্যাম সংক্ষেপে 'ইডিও র‍্যাম', 'সিনক্রোনাস র‍্যাম'-সংক্ষেপে 'এসডি-র‍্যাম'।

একটি বিটের জন্য একের অধিক ট্রান্সিস্টর থাকে এস-র‍্যামে। কম্পিউটার ডি-র‍্যামের চেয়ে এস-র‍্যামে দ্রুত ডাটা পড়তে পারে। তবে অসুবিধা হলো এস-র‍্যামের জন্য বেশি বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। দ্রুত পড়া প্রয়োজন ওই রকমের কাজের জন্য এস-র‍্যাম ব্যবহৃত হয় বেশি।

ডাটা পড়া এবং লেখার ক্ষেত্রে এক্সেস টাইম একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক বিট ডাটা মেমোরিতে লিখতে বা মেমোরি থেকে পড়তে সি.পি.ইউর যে পরিমাণ সময় দরকার হয় তাই-ই এক্সেস টাইম। বর্তমানে ডি-র‍্যামের একসেস টাইম ৬০ থেকে ৮০ ন্যানো সেকেন্ডের ভেতর এক এস-র‍্যামের গতি এর চেয়ে চার ৫ গুণ বেশি। মেমোরি পরিমাপ করা হয় বাইটে। ১০০ বাইটে ১ কিলোবাইট। কম্পিউটারে র‍্যাম বাড়ানোর একটা ব্যাপার রয়েছে। তাই জানা দরকার র‍্যাম কেন বাড়াতে হবে। বেশি পরিমাণ র‍্যাম কম্পিউটারের কাজের গতি ও দক্ষতা বাড়ায়। অপারেটিং সিস্টেম এবং প্রোগ্রামগুলোর আসলে প্রথমে র‍্যামে রাখা হয়। বেশি প্রোগাম চালানোর জন্য তাই বাড়তি জায়গার দরকার। যে ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করা হয় সেগুলো সাধারণত র‍্যামে রাখা হয়। ছবি বা গ্রাফিকস্ ধরনের ফাইলগুলো আকারে বড় হয় এবং এরা জায়গাও নেয় বহু। যখন র‍্যামে অনেক জিনিস রাখা সম্ভব হয় না তখন তা রাখা হয় হার্ড ডিস্কে। তবে ব্যবহারের সময় অবশ্যই হার্ডডিস্ক থেকে র‍্যামে নিতে হয় এবং পরে আবার হার্ডডিস্কে। বর্তমানে ৬৪ মেগাবাইট র‍্যাম এখনকার প্রোগ্রামগুলো চালানোর জন্য অনেকটা যথেষ্ট।

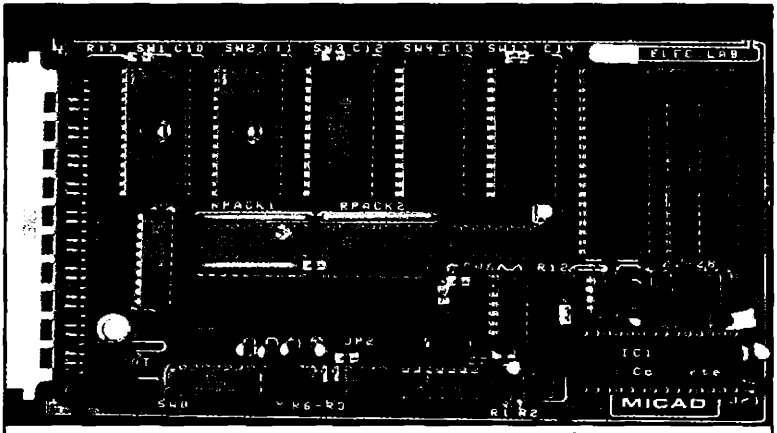

Parts of Mother Board - মাদার বোর্ডের একাংশ

মাদারবোর্ড I Mother Board

এই মাদারবোর্ডের অপর নাম 'সিস্টেম বোর্ড'। এটি কম্পিউটারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাদারবোর্ড হচ্ছে কম্পিউটারের প্রধান সার্কিটবোর্ডে সি.পি.ইউ, র‍্যাম, এক্সপানশন স্লট, পোর্ট ইত্যাদি থাকে। মাদারবোর্ডের ভিতরে একটি চিপ থাকে যার নাম চিপসেট। এর মাধ্যমে মেমোরি ইনপুট, আউটপুট, বাস ইনপুট, আউটপুট, ডি.এম.এ., আই আর কিউ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রত্যেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে এমন মাদারবোর্ড ক্রয় করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে আপগ্রেড করিয়ে নেওয়া যায়। ধরা যাক এখন বোর্ড পেন্টিয়াম কম্পিউটার ক্রয় করলো তখন তাকে মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতে তার পিসি আপগ্রেড করার প্রয়োজন হলে তখন এই মাদারবোর্ড সেই সুবিধা দেবে কিনা এটা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

বাস

কম্পিউটারে বাস মূলত একটি বৈদ্যুতিক সংযোগ। সি.পি.ইউ'র ভেতর, মেইন মেমোরি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের মধ্যে বাসে সাহায্যে ডাটা স্থানান্তরিত হয়। অনেকগুলো তারের সাহায্যে বাস তৈরি হয়। তাই সচরাচর তারের সংযোগগুলোকেই 'বাস' বলা হয়ে থাকে। বাস দিয়ে একাধিক বিট ডাটা পাঠানো যায়। ১৬ বিটের বাসে ১৬টি সমান্তরাল তার থাকে। এর ফলে একটা ডিভাইস বা যন্ত্র থেকে অন্য কোনো ডিভাইস একযোগে ১৬ বিট বা ২ বাইট তথ্য পাঠানো সম্ভব। বাসের মাপ সাধারণত ৮, ৩২, ৬৪, ১২৮ বিট হয়ে থাকে। বাস যত বড় হবে তত বেশি ডাটা স্থানান্তর সম্ভব হবে। ফলে কাজের গতিও বাড়বে অনেক। কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য বাসের গঠন কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে পিসির যেমন উন্নতি সাধিত হয়েছে তেমনি এর সঙ্গে সঙ্গে বাসের মান এবং গঠনও

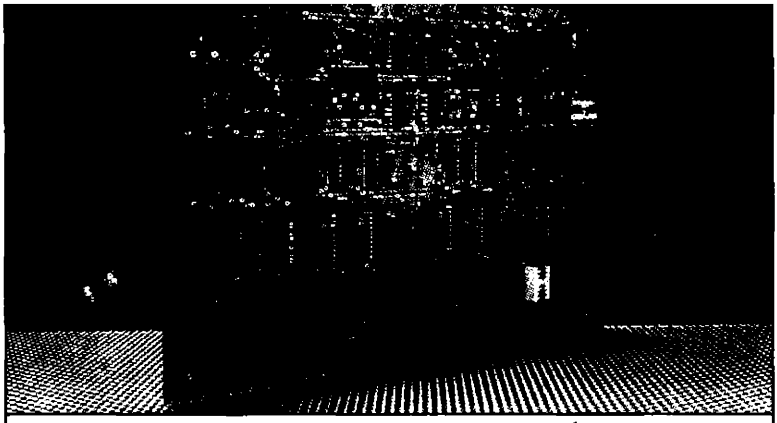

Parts of Mother Board - মাদার বোর্ডের একাংশ

পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম যখন বাজারে আই.বি.এম. কম্পিউটার এলো তখন তাতে ৮ ও ১৬ বিটের আই.এস.এ বাস ব্যবহৃত হতো। এই প্রকারের বাসের গতি ছিল মাত্র ৮ মেগাহার্জ, যা দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৮ মেগাবাইট ডাটা স্থানান্তর করা যেত। ওই বাসের সাহায্যে ২৮৬ মেশিন চলছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ৩৮৬ মেশিনে ব্যবহৃত হয়েছে মাইক্রোচ্যানেল আর্কিটেকচার। এর পাশাপাশি আবার পিসি'তে এইসা ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও আলাদাভাবে লোকাল বাস যেমন ভেসা ব্যবহৃত হতো। বর্তমানের কম্পিউটারের ৬৪ বিটের পি.সি.আই. বাস ব্যবহৃত হয়।

ক্যাশ। Cash

'ক্যাশ' কম্পিউটারের ব্যবহৃত একটি আলাদা মেমোরি। মূল মেমোরির শাখা হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এটিকে দু ভাবে লাগানো যেতে পারে। যে ক্যাশ সি.পি.ইউ'র সঙ্গে লাগানো হয় সেটিকে 'ইন্টারন্যাল ক্যাশ' বলে। আর যেটি আলাদাভাবে মাদারবোর্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে তাকে 'এক্সটার্নাল ক্যাশ' বলে। ডিস্ক ক্যাশ কিছুক্ষণের জন্য ডাটা ধরে রেখে সি.পি.ইউর কাজের ভার কমায়। ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও সি.পি.ইউ. মুক্ত থাকে। পেন্টিয়াম টু কম্পিউটারে ক্যাশ মেমোরি থাকে প্রসেসরের ভেতরে। ক্যাশ মেমোরির ডাটা ধারণ ক্ষমতা সচরাচর ৫১২ কিলোবাইট। তবে কোনো কোনো প্রসেসর ১ থেকে ২ মেগা বাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সিস্টেম ক্লক। System Block

বাণিজ্যিকভাবে তৈরি প্রত্যেক কম্পিউটারে একটা সিস্টেম ক্লক থাকে। এটি দিয়ে কম্পিউটারের গতি মাপা হয়। সাধারণত কোয়ার্টাজের ক্রিস্টাল দিয়ে সিস্টেম ক্লক তৈরি

করা হয়। এই ক্লকের গতি প্রসেসরের গতি ওপর নির্ভর করে। এর গতির পরিমাণ মেগাহার্জে পরিমাপ করা হয়। পেন্টিয়াম টু কম্পিউটারে ২০০ মেগাহার্জেরও বেশি গতি পাওয়া যায়। পেন্টিয়ম থ্রি'তে তো কম করে হলেও ৪৫০ মেগাহার্জ গতি।

রম চিপ। ROM Chip

কম্পিউটারে রম এক ধরনের আভ্যন্তরীণ মেমোরি। রম-এর পুরো অর্থ হলো 'রিড অনলি মেমোরি'। রম চিপস কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন : প্রম, এ পরম, এ পরম, ইএপরম। প্রম বা প্রোগ্রোমেবল রিড অনলি মেমোরি'তে একবার লেখা হলে আর বদলানো যায় না। এ পরম বা ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরিতে লেখার পর ডাটা বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে মোছা যায় এবং আবার লেখা যায়। আর এ লেখার কাজে অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহার করা হয়। ইএ পরম বা ইলেক্ট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি'তে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করে ডাটা ও প্রোগ্রাম লেখা যায়। এই রমকে 'ফ্ল্যাশ রম'ও বলা হয়ে থাকে।

গ্রাফিক্স কার্ড। Grapics Card

ভিডিও সংকেত প্রক্রিয়া করার জন্য কম্পিউটারের পিসিতে গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করা হয়। এটি পিসি'তে একটি বাড়তি সংযোজন। গ্রাফিক্স কার্ডকে ডিসপ্লে এডাপটার বা 'ভিডিও কন্ট্রোলার' বলা হয়। গ্রাফিক্স কার্ড পিসিআই এবং এজিপি স্লটে ব্যবহৃত হয়। মনিটরে কী পরিমাণ রং প্রদর্শন করবে তার উপর নির্ভর করে গ্রাফিক্স বোর্ডের ক্ষমতা। গ্রাফিক্স বোর্ডের রংয়ের পরিমাণ বিট দিয়ে পরিমাপ করা হয়। বিটের পরিমাণ বেশি হলে রং দেখানোর ক্ষমতাও বেশি হয়। যেমন : ৮ বিটের বোর্ড ২৫৬টি রঙ দেখাতে পারে। ২৪ বিটের বোর্ড ১ কোটি ৬৭ লক্ষ রঙ প্রদর্শন করতে সক্ষম। এটি একটি অবাক করার মতো কথা।

কন্ট্রোলার। Controller

কম্পিউটারে এটি এক ধরনের সার্কিট বোর্ড। প্রসেসর, পাওয়ার সাপ্লাই, ডিস্ক, ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ ইত্যাদির জন্য কন্ট্রোলার লাগে ডিস্কে কাজের নিয়ন্ত্রণের জন্য। ডিস্ক ও সিপিইউর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করে থাকে কন্ট্রোলার।

স্টোরেজ হার্ডওয়্যার

কম্পিউটার যখন কাজ করে তখন বিভিন্নভাবে তথ্য জমা করে রাখতে হয়। বার বার ব্যবহারের জন্য ডাটা ও সফটওয়্যারকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণও করতে হয়। তাই প্রয়োজন হয় জমিয়ে রাখার মতো জিনিসের। এ কাজটি করে স্টোরেজ

হার্ডওয়্যার।

কম্পিউটারে ডাটা দু ভাবে সংরক্ষিত হতে পারে। তার একটি হচ্ছে প্রাইমারি, অন্যটি সেকেন্ডারি। একে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক মেমোরি স্টোরেজও বলা হয়। বা প্রাথমিক ধারক হচ্ছে র‍্যাম। দীর্ঘস্থায়ীভাবে তথ্য ধারণের জন্য সেকেন্ডারি স্টোরেজ মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়। সেকেন্ডারি ধারক হিসেবে নানা ধরনের মিডিয়া বা মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে রয়েছে হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, জিপ ডিস্ক, সিডি রম, ডিভিডি রম প্রভৃতি।

হার্ড ডিস্ক। Hard Disk

কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক দ্রুত গতির স্টোরেজ মিডিয়া বা তথ্য জমা রাখার জিনিস। এর তথ্য জমিয়ে রাখার ক্ষমতাও অনেক বেশি। আজকালকার অপারেটিং সিস্টেম ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো আকারে বেশ বড়। ব্যবহারকারীরাও বহু বড় আকারের ফাইল তৈরি করে। তাই এতো সব জিনিস হার্ড ডিস্কে জমা রাখার জন্য জায়গাও প্রচুর লাগে। মাইক্রোকম্পিউটারে প্রথম দিকে হার্ড ডিস্ক ছিল না। আই.বি.এম পিসি এক্সটিতে হার্ডডিস্ক সংযোজন করা হয়। এই হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল মাত্র ১০ মেগাবাইট। ডাটা ধারণ ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের গোড়াতে ৩ বা ৫ গিগাবাইট সকলের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতো। আর ১৯৯৯-এর শেষে ৮ থেকে ১০ মেগাবাইট হয়ে দাঁড়ায় ন্যূনতম। হার্ড ডিস্কের আকার আরো বড় হচ্ছে। আরো বড় আকারের হার্ড ডিস্ক অনেকেই হয়তো ব্যবহার করবেন অদূর ভবিষ্যতেই।

হার্ড ডিস্ক ধাতুর তৈরি। এটি শক্ত বলে এর নাম হার্ড ডিস্ক। হার্ড ডিস্কটি রাখা হয় বায়ুশূন্য আধারে। হার্ড ডিস্ক বেশ দ্রুত গতির হয়। বহু ডাটা ধারণ করতে পারে।

Hard Disk Drive - হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ

এর ভেতরে রয়েছে কতগুলো প্ল্যাটার। সেগুলো অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতোশক্ত ও গোলাকার। এটির উপর চৌম্বক পদার্থের আস্তরণ দেওয়া হয়। প্ল্যাটার মাঝখান বা কেন্দ্র থেকে স্পিন্ডলের সাথে যুক্ত থাকে। স্পিন্ডল সরু একটি দণ্ড বিশেষ। স্পিন্ডলের এক প্রান্তে আছে একটি মোটর। মোটরটি নির্দিষ্ট গতিতে দ্রুত ঘোরে। ওই গতিকে আর.পি.এম বা প্রতি মিনিটে ঘুর্ণনের সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। হার্ডডিস্ক ভেদে এই গতি মিনিটে ৩৬০০, ৪৫০০০ কিংবা ৭২০০ বার হতে পারে। এটি ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

ফ্লপি ডিস্ক I Flopy Disk

কম্পিউটারের ফ্লপি ডিস্ক দেখতে ছোট। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সাড়ে ৩ ইঞ্চি। এক সময়ে সোয়া ৫ ইঞ্চির ফ্লপিও ছিল। তবে এখন তার প্রচলন নেই বললেই চলে। দামে সস্তা, সহজে এদিক ওদিকে নেওয়া যায়। তাই ফ্লপি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এতে করে কম্পিউটারের ফাইল স্থানান্তর করার কাজটিও সহজ। শুরুতে ফ্লপিতে ৩৬০ বা ৭২০ কিলোবাইট ডাটা সংকুলান করা যেত। এখন একটি ফ্লপি ১৪৪ মেগাবাইট ডাটা ধারণ করতে পারে। ফ্লপি ডিস্ক বহনযোগ্য বা অপসারণযোগ্য মাধ্যম। ফ্লপি ডিস্কের বাইরে থাকে শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি আবরণ। তার ভেতরে আছে মেটাল অক্সাইডের তৈরি ফিল্ম বা ডিস্ক। একে বলে 'কুকি'। ফ্লপিতে ডাটা ও প্রোগ্রামকে চৌম্বক সত্তা হিসেবে জমা রাখা হয়। অর্থাৎ চৌম্বকীয় আবেশের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দিয়েই ডাটা জমা করা হয়।

এর ডিস্ক ড্রাইভটিতে থাকে একটি ড্রাইভ গেট বা ড্রাইভ ডোর। এখানে চাপ দিয়ে ফ্লপিটিকে ঢোকাতে হয়। কাজের সময় বা ডাটা বিনিময়ের সময় একটি এলইডি

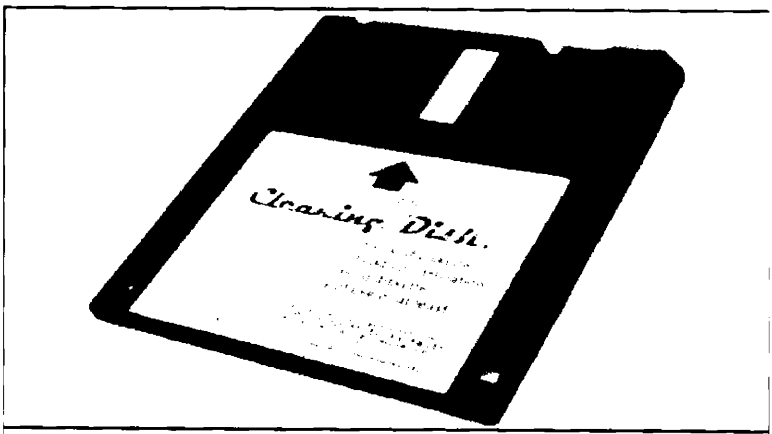

Floppy Disk - ফ্লপি ডিস্ক

বাতি জ্বলতে থাকে। ফ্লপিটি ঢোকানোর পর ভেতরে ড্রাইভে স্প্রিং ও লিভারের কার্যক্রমের ফলে শাটারটি খুলে যায়। ড্রাইভ হেড তখন কুকির সংস্পর্শে আসে। ডাটা তখন পড়া যায় কিংবা লেখা যায়। সাধারণত একটি ড্রাইভে এরকম দুটি রিড বা রাইট হেড থাকে। ফ্লপিতে বাম দিকে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রটি বন্ধ করা যায়, খোলাও রাখা যায়। খোলা অবস্থায় এটি রাইট প্রটেক্টেড অবস্থায় থাকে। তখন ডাটা লেখা যায় না, তবে পড়া যায় অতিসহজে।

সিডি রম। CD ROM

কম্পিউটারের সিডি রম বা সিডি বলতে বোঝায় এক ধরনের ডিস্ককে। কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড ওনলি মেমোরি'র সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে সিডি রম। সিডি চালানোর জন্য সিডি ড্রাইভ প্রয়োজন হয়। সিডি রম পড়া হয় সিডি ড্রাইভে। সিডি ড্রাইভের সঙ্গে সাধারণত ই.আই.ডি.ই. বা স্কাজি ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয়। সিডি'র গতি বোঝাতে সাধারণত ৩২x, ৪০x, ৫৪x উল্লেখ করা হয়। এক্স বা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ১৫০ এর গুণিতক বোঝানো হয়। প্রথম যুগের সিডির সাথে তুলনা করে এ হিসাব করা হয়। প্রথম যুগে সিডি রমের ডাটা স্থানান্তরের হার ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ কিলোবাইট। পরে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথম দিকে সিডি রমে ছিল শুধু টেক্সট। তার সাথে যোগ হলো ছবি, শব্দ, এনিমেশন ও ভিডিও। ওগুলো পড়ার জন্য সিডি ড্রাইভের গতি বাড়াতে হয়েছে। তাই সিডি ড্রাইভের গতি যত বেশি হয় ততই ভালো হয়।

যেকোনো তথ্য পাঠ বা ধারণের জন্য সিডি রমে অপটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। অপটিক্যাল প্রযুক্তিতে আলোই হচ্ছে উপাদান। এতে লেজার রশ্মিকে ডাটা পড়া-লেখার কাজে ব্যবহার করা হয়। এলজার এক ধরনের আলোক রশ্মি। এর বৈশিষ্ট্য

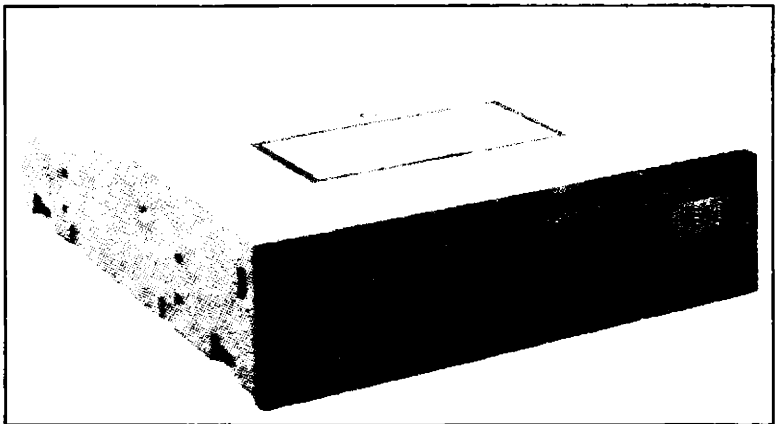

CD Rom Drive - সিডি রম ড্রাইভ

এই যে, এর গতিপথ সরল, এবং তা গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। এর রঙ সব সময় একই রকম। এর ঘনত্ব অনেক বেশি এবং তরঙ্গগুলো অতি সূক্ষ্ম।
সিডি দেখতে গোলাকার। এর ব্যাস বা ডায়ামিটার ১২০ মিলিমিটার (৪.৭২ ইঞ্চি)। ভেতরে একটি গোল ছিদ্র আছে। সিডি রম ড্রাইভে শুধু পড়াই যায়, লেখা যায় না। সেটি লেখার জন্য আলাদা ড্রাইভ রয়েছে। তার নাম 'সিডি রাইটার'। সিডি রাইটার অবশ্য যে কোনো কম্পিউটারে সিডি রম ড্রাইভের মতোই লাগানো যায়। সেক্ষেত্রে ডাটা পড়াও যায়, লেখাও যায়। লেজার রশ্মির মাধ্যমে সিডি রাইটার সিডি ডিস্ক পুড়িয়ে স্থায়ী গর্ত তৈরি করে। ওগুলোর নাম 'পিট'। দুটি পিটের মাঝখানে থাকে ল্যান্ড। সিডি ড্রাইভ এগুলো পড়তে পারে। ডাটা লেখার সময় সিডিতে গর্ত করা হয়। এ গর্তের নাম পিট। পিটগুলোর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ০.২৫ মাইক্রন। এক মাইক্রন এক মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগের সমান। এক একটি সিডিতে ওরকম কয়েক বিলিয়ন পিট থাকে। গর্ত থেকে প্রতিফলিত আলো উচ্চ বিট ১ রূপে এবং ল্যান্ড থেকে প্রতিফলিত আলো নিম্ন বিট ০ রূপে চিহ্নিত করা হয়।
সিডির দুটি পিঠ। একপিঠে থাকে লেবেল, অন্য পিঠটি উজ্জ্বল। তা থেকে রঙ ধনুর আলো বিচ্ছুরিত হয়। প্রতিটি সিডিতে আছে তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে আছে প্লাস্টিকের পরত। মাঝখানের স্তরে থাকে এলুমিনিয়ামের কিংবা রূপার পরত। ওই স্তরেই ডাটা পুড়িয়ে সৃষ্টি করা হয় পিট ও ল্যান্ড। এই স্তরে আলো প্রতিফলিত হয়। তার উপরের স্তরে থাকে এক্রাইলিকরেসিনের একটি স্তর। এটি যান্ত্রিক ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে। যে পিট থেকে আলো প্রতিফলিত হয় সে পিঠ দিয়েই ডাটা পড়ার কাজটি হয়। সিডি ড্রাইভে সিডি এমনভাবে ঢোকাতে হয় যাতে লেজার আর এলুমিনিয়ামেব স্তর মুখোমুখি থাকে। কিছু কিছু সিডিতে ডাটা বার বার মোছা ও লেখা যায়। এ ধরনের রেকর্ডেবল সিডিতে চারটি স্তর থাকে। তার একটিতে থাকে ফটোসেনসিটিভ পদার্থ। তখন পিঠ সৃষ্টির স্তরটিতে ডাটা ধারণের জন্য এলুমিনিয়ামের বদলে খাঁটি স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়। সিডিতে ডাটা রাখা হয় ধারাবাহিকভাবে। সিডির ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এতে ৬৫০ মেগাবাইটে এ-৪ সাইজের কাগজের ২৫০ হাজার পৃষ্ঠা টেক্সট রাখা যায়। রাখা যায় অসংখ্য ছবি। রাখা যায় ৭৪ মিনিটের ভিডিও। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেপ ড্রাইভ। Tape Drive

একথা সত্য যে, কম্পিউটার কাজের ক্ষেত্রে যত পারদর্শিতাই দেখাক না কেন, তা সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। বা তার ওপর নির্ভর করলে ব্যবহারকারী বহু ধরনের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে পারেন। বহু কষ্টে, বহু দিনের পরিশ্রমের পর তৈরি করা ডাটা এক মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হারিয়ে যেতে পারে চিরদিনের জন্য। তাই কম্পিউটারে তৈরি ডাটা বা ফাইলের ব্যাক আপ রাখতে হয়। ডাটা ব্যাক আপের জন্য ম্যাগনেটিক টেপ বহু ব্যবহৃত মাধ্যম। এতে রয়েছে ম্যাগনেটিক

মেমোরি। এতে ব্যবহৃত হয় বিশেষ ধরনের কার্টিজ। ওগুলোর ধারণ ক্ষমতা ৫ থেকে ৮ গিগাবাইট বা তারও অনেক বেশি হয়ে থাকে।

জাজ ডিস্ক। Jug Disk

কম্পিউটারে কাজের পর তার সংরক্ষণ ছাড়াও পরিবহনের প্রয়োজন মাঝে মাঝেই হয়। সাধারণ ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা এতোই কম যে, বিশেষ কাজের জন্য সেগুলো একেবারেই অনুপযুক্ত। একটি সাধারণ মানের ইমেজ ফাইলও তাতে ধারণ করা সম্ভব হয় না। বড় আকারের ব্যাক আপ রাখার জন্য জাজ ডিস্ক বা জিপ ডিস্ক ব্যবহার করা যায়। জাজ ডিস্কের নির্মাতা আইওমেগা নামের প্রতিষ্ঠান। এ ডিস্কটি অপসারণযোগ্য। একটি ডিস্কে ১ গিগাবাইট ডাটা ধারণ করা যায়। ওটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪ ইঞ্চি এবং এটি আধ ইঞ্চি পুরু। এটি হার্ড ডিস্কের মতোই ব্যবহার করা সম্ভব। কম্পিউটারে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জিপ ডিস্ক। Gip Disk

এটির নির্মাতা আইওমেগা নামক প্রতিষ্ঠান। এতে ১২০ মেগাবাইট পর্যন্ত ডাটা ধারণ করা যায়। ওটি দেখতে সাধারণ ফ্লপি ডিস্কের চেয়ে সামান্য বড়। এতে ফ্লপিও পড়া যায়। এটি চালানোর জন্য জিপ ড্রাইভ দরকার।

ডিভিডি। DVD

কম্পিউটারে ডিভিডি আরেক ধরনের স্টোরেজ হার্ডওয়্যার। ডিভিডি হচ্ছে ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। হলিউডের চিত্র নির্মাতাদের আগ্রহ ও

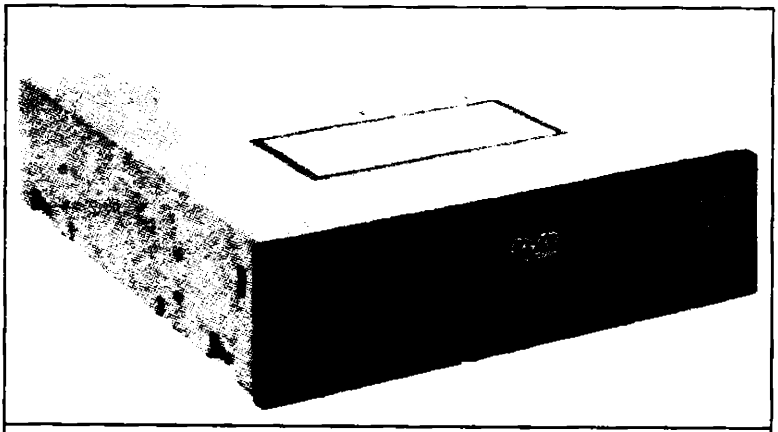

DVD Rom Drive - ডিভিডি রম ড্রাইভ

পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার হয়েছে। কারণ, পূর্ণ রেজোলিউশনে এক একটি সিনেমা ধারণ করার জন্য খুবই বড় মাপের স্টোরেজ মাধ্যমের দরকার। সিডি তার জন্য পর্যাপ্ত নয়, তাই ডিভিডি'র আবির্ভাব হয়েছে। ডিভিডি'র আকার সিডির মতো, ব্যাস ১২০ মিলিমিটার। ডিস্কের পুরুত্বও একই রকম। ১.২ মিলিমিটার। সিডিতে ডাটা ধারণের জন্য একটি পাশই ব্যবহার হয়। ডিভিডি'তে দু পাশেই ডাটা ধারণ করা সম্ভব। আসলে ডিভিডির শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার প্রযুক্তিতে। ডিভিডি'র ডাটা ধারণ ক্ষমতা অনেক অনেক গুণ বেশি।

আউটপুট হার্ডওয়্যার

আউটপুট হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের আউটপুট মাধ্যমগুলো লেখার কাজ করে। সেগুলো প্রদর্শন উপযোগী। কম্পিউটার আউটপুট দু ধরনের হয় আর নাম হার্ড কপি ও সফট কপি যা দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না, তা সফট কপি। ওগুলো থাকে মনিটরে কিংবা ফ্লপি বা হার্ড ডিস্কে। বিভিন্ন আউটপুট হার্ডওয়্যারের পরিচিতি দেওয়া হলো :

মনিটর	বাবল জেট প্রিন্টার/ইঙ্কজেট প্রিন্টার
এল.সি.ডি	প্লটার
প্রিন্টার	ফটো প্রিন্টার
ডেইজি হুইল প্রিন্টার	বহুমুখী প্রিন্টার
ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর
লাইন প্রিন্টার	এল.সি.ডি প্রজেকশন প্যানেল
লেজার প্রিন্টার	স্পিকার

মনিটর I Monitor

এটাকে কেউ বলে 'মনিটর', কেউ বলে 'স্ক্রিন'। কী বোর্ডে আমরা যখন যা লিখছি, সঙ্গে সঙ্গে তা মনিটরে বা স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে। আমাদের কাজের ফলাফল আমরা মনিটর থেকেই জানতে পারছি। আবার কম্পিউটারের কোনো বার্তা থাকলে তাও মনিটর থেকেই অতি সহজে জেনে নিচ্ছি। আমাদের সাথে কম্পিউটারের যোগাযোগের জন্য মনিটর গুরুত্বপূর্ণ। মনিটর প্রথম দিকে ছিল একরঙা। এখনকার মনিটরগুলো রঙিন। তাতে টেক্সট ও গ্রাফিকস বিভিন্ন রঙে প্রদর্শন করা হয়। মনিটর বিভিন্ন ধরনের হয়। ডেস্কটপ কম্পিউটারে মূলত সি.আর.টি মনিটর ব্যবহৃত হলেও ল্যাপটপে এল.সি.ডি ডিসপ্লে ব্যবহৃত হয়।

সিআরটি মনিটরের প্রধান অংশ হচ্ছে সিআরটি বা ক্যাথোডরে টিউব। একে পিকচার টিউবও বলে। টেলিভিশনেও এই পিকচার টিউবটি ব্যবহৃত হয়। এর সামনের দিকে কাঁচের ওপর থাকে ফসফরের আবরণ সিআরটির কাঁচের পেছনে

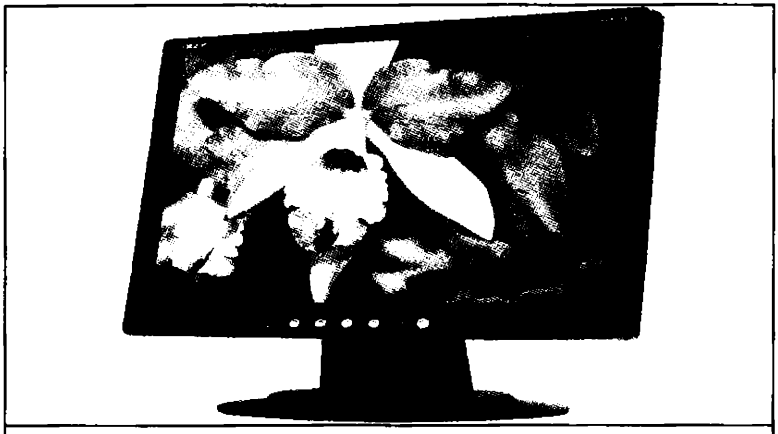

LCD Monitor - এলসিডি মনিটর

থাকে একটি ইলেক্ট্রনিক গান। এই গান থেকে ক্রমান্বয়ে ইলেক্ট্রন নির্গত হয়ে ফসফরে আঘাত করতে থাকে। তার ফলে ফসফর জ্বলে ওঠে। বেশি পরমাণ ইলেক্ট্রন আঘাত করলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। এভাবে ইমেজ বা ছবি পর্দায় দৃশ্যমান হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ১৪ বা ১৫ ইঞ্চি মনিটর ব্যবহার করি। তবে মনিটর তার চেয়ে ছোটও আছে, বড়ও আছে। বড় আকৃতির মনিটরের দাম কমতে থাকায় সেগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ১৭ ইঞ্চি মনিটরের দামও তেমন একটা বেশি নয়এব ২১ ইঞ্চি মনিটরের দাম একটু বেশি। সাধারণ টেক্সট প্রসেসিংয়ের জন্য ১৪ বা ১৫ ইঞ্চি যথেষ্ট হলেও ডিটিপি'র বা গ্রাফিকসের কাজ করার জন্য বড় মনিটর থাকলে সুবিধা।

এল সি ডি I LCD

এল.সি.ডি হচ্ছে 'লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এতে ব্যবহৃত হয় তরল স্ফটিক। এ স্ফটিকের অণুগুলো বিদ্যুতের প্রতি সংবেদনশীল। বিদ্যুৎ সংকেত অনুযায়ী ওগুলো সক্রিয় হয়। মনিটরে পেছনটাকে আলোকিত করা হয় (ব্যাকলাইটিং)। সাধারণ অবস্থায় এ আলো স্ফটিককে গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। বিদ্যুৎ চালিত হলে স্ফটিকগুলোর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। তখন সেগুলোর ভেতর দিয়ে আলো গলে যেতে পারে। সে অবস্থায় পর্দায় দৃশ্য দেখা যায়।

প্রিন্টার I Printer

আমরা যে কাজ করি সেগুলো দেকার জন্য ছাপতে হয়। কম্পিউটারে ছাপার কাজটি করে প্রিন্টার। প্রিন্টার অনেক রকমের। কোনো কোনোটির ছাপা ঝকঝকে।

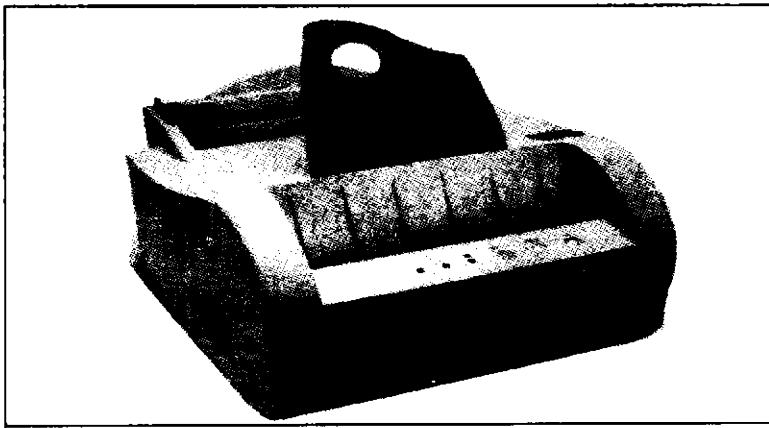

Laser Printer - লেজার প্রিন্টার

ছাপাখানার ছাপা বই যেমন দেখতে সে রকমই। আবার কোনো কোনোটি তার চাইতে ভিন্ন, মান ততটা উন্নত নয়একানও। কোনো প্রিন্টার দিয়ে রঙিন কালিতেও ছাপা যায়। ছাপার পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রিন্টারকে দু ভাগে করা যায়। যেমন : ইমপ্যাক্ট এবং নন– ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার। ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার অনেকটা টাইপরাইটারের ন্যায়। ওগুলোতে লেখা তৈরি হয় প্রিন্ট হুইল বা প্রিন্ট হেড দিয়ে। সেই হুইল বা হেড গিয়ে ফিতার ওপর আঘাত করে। সেই ফিতায় কার্বন লাগানো থাকে। সেই কার্বন থেকে কাগজের উপর লেখা ছাপা হয়। ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার সে ধরনের একটি প্রিন্টার। নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারকে কাগজের উপর আঘাত করতে হয় না। লেজার বা বাবল জেট প্রিন্টার সে ধরনের প্রিন্টার।

কম্পিউটারের বাইনারি পদ্ধতি

বাইনারি পদ্ধতি I Binary System

তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার ব্যাবলনীয় ব্যবসায়ীরা যেমন আঙ্গুলে গোণা থেকে দশ-সংখ্যা ভিত্তিক গণনা সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তেমনি আধুনিক ইলেকট্রনিক বর্তনীর খোলা-বন্ধ সুইচ থেকে দুই সংখ্যা ভিত্তিক গণিত কম্পিউটার শিল্পের জন্য গড়ে উঠেছে। বাইনারি পদ্ধতি কম্পিউটারে যেসব কারণে ব্যবহার করা হয় তা হলো : ১. কম্পিউটারে তথ্য সঞ্চয় করার যন্ত্রাংশগুলো বাইনারি প্রকৃতি ২. দুটো মাত্র বিকল্পের উপর ভিত্তি করে গড়া যন্ত্রাংশের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি এবং ৩. বাইনারি গণিত জটিল বিদ্যুৎবর্তনী ছাড়াই বাস্তবায়িত করা যায়। কম্পিউটারে বাইনারি প্রকৃতির যন্ত্রাংশের একটা সহজ উদাহরণ হলো তার স্মৃতি (মেমোরি)। তথ্য সঞ্চয়ের জন্যে আজকাল প্রধানত ব্যবহার করা হয় ম্যাগনেটিক কোর। চৌম্বক-মর্মকে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে চুম্বকায়িত করা হয় বা হয় না। সুতরাং চৌম্বক-মর্মটি

বাইনারি প্রকৃতির। একইভাবে একটি ইলেকট্রিক রিলে (বাহক) বা সুইচ হয় খোলা থাকে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যে, নয় তা বন্ধ থাকে; সুতরাং এটাও বাইনারি প্রকৃতির। প্রশ্ন উঠতে পারে বাইনারি পদ্ধতিতে আমরা যে দুটো সংকেত শূন্য এবং এক ব্যবহার করি তা দিয়ে কি গণিতের সব কাজ করা সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর হলো যে, তা অবশ্যই সম্ভব আর তার মৌলিক কারণ হলো ইলেকট্রিক পদ্ধতির দ্রুত গতি। কম্পিউটার 'খোলা' এবং 'বন্ধ' এ দুই বিকল্পের মধ্যে আসা-যাওয়া করে প্রায় আলোকের গতিতে আর তাই ওই একই গতিতে চলে আমাদের গণনার কাজ। যেহেতু শুধু দুটো অবস্থায় উপর ভিত্তি করে গড়া তাই এসব যন্ত্র তৈরি করাও সহজ। মৌলিক সংকেত সংখ্যা যত কম, যন্ত্রাংশের আচরণও তত নির্ভরযোগ্য। কম্পিউটারের আভ্যন্তরীণ কাজ যদিও বাইনারি যন্ত্রাংশ দিয়ে করা হয় তবু তথ্য আদান-প্রদান আমরা দশমিক পদ্ধতিতেই করি। কেননা তাতেই আমরা ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত। এ জন্যই কম্পিউটারের ভিতরে ওই অনুবাদের কাজটি পূর্বসঞ্চিত নির্দেশনের মাধ্যমে ইলেকট্রিক বর্তনীয় সাহায্যে করা হয়।

এ দুই পদ্ধতির মূল কথাটি এখানে সংক্ষেপে বলা যায়। আমরা সকলেই জানি যে, দশমিক পদ্ধতি স্থানভিত্তিক। কোনো রাশিতে একটি সংখ্যার অবস্থান তার মান নির্দেশ করে। ডান দিক থেকে হিসেব করে আমরা অবস্থানের মান ঠিক করে নিয়েছি একক, দশক, শতক, হাজার ইত্যাদি সংখ্যায়। সুতরাং ২৩৪ রাশির ২ সংখ্যাটি শতক মানের, ৩ সংখ্যাটি দশক মানের এবং ৪ সংখ্যাটি একক মানের। অতএব আমরা লিখতে পারি, $২৩৪=২\times১০০+৩\times১০+৪\times১$

শূন্যের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে এভাবে লেখা কষ্টকর। তাই যে কয়টা শূন্য আছে সেই সংখ্যা ১০-এর উপরে লিখে রাশিটি এভাবে প্রকাশ করা যায়, $২৩৪=২\times১০^{২}+^{৩}\times১০^{১}+৪\times১০$

এখানে ১০-এর উপরে শূন্য থাকলে আমরা তাকে ১ ধরে নিই। যে কোনো রাশিকে এভাবে প্রকাশ করাই হলো দশমিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এ পদ্ধতিতে ১০-এর বিভিন্ন ঘাত দিয় আমরা সংখ্যার অবস্থানের মান নির্দেশ করি। যেমন ১০-এর ৩ ঘাত হলো হাজার, ২ ঘাত হলো শতক ইত্যাদি।

দশমিক পদ্ধতিতে ভগ্নাংশের জন্যেও একই ব্যাপার করা হয়। যেমন কোনো বস্তুর চারভাগের একভাগকে আমরা ভগ্নাংশে লিখি ১/৪। কিন্তু দশমিক ভগ্নাংশে ঐ একই সংখ্যাকে লেখা হবে ০.২৫। এ রাশির অর্থ হলো একশ ভাগের ২৫ ভাগ যা আসলে চার ভাগের এক ভাগই। দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক চিহ্নের পরে অবস্থানের মান দশের বিভিন্ন ঘাতে কমে যায়। যেমন : $০.২=২\times১০-১$

$০.২৫=২\times১০^{-১} + 5\times১০^{-২}$ ইত্যাদি সুতরাং ১২.৩৪ এই দশমিক ভগ্নাংশের রাশিটি এভাবে প্রকাশ করা যায়, $১২.৩৪ = ১ \times ১০^{১}+২ \times ১০ + ৩ \times ১০^{-১}+৪ \times ১০^{-২}$

বাইনারি পদ্ধতিতেও ঠিক একই করা হয়। কিন্তু এখন ১০ সংখ্যার জায়গায় ২ ব্যবহার করা হবে। কেননা এ পদ্ধতিতে মৌলিক সংখ্যা হলো দুটো ০ এবং ১। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটা বাইনারি সংখ্যা ১০১১.১১ নিতে পারি। এই রাশির তাৎপর্য হলো, $১০১১.১১=১\times২^{৩}+০\times২^{২}+১\times২^{১}+১\times২^{০}+১\times২^{-১}+১\times২^{-২}$

কিন্তু দশমিক পদ্ধতিতে ২৩=৮,২২=৪,২১=২,২০=১

$২^{-১}=১/২ =০.৫$, $২^{-২}=১/৪ = ০.২৫$

সুতরাং আমাদের বাইনারি রাশিটিকে ভাষান্তর করে পাই, ১০১১.১১=১× ৮+০×৪+১×২+১×১+১×০.৫+১×০.২৫=৮+২+১+০..৫+০.২৫=১১.৭৫

বাইনারি পদ্ধতিতে ১০১১.১১ রাশির দশমিক পদ্ধতিতে মান হলো ১১.৭৫। নিচের সারণীতে কতগুলো ছোট সংখ্যার ভাষান্তর দেখানো হলো :

সারণী

বাইনারি	দশমিক	বাইনারি	দশমিক
০	০	১	১
১০	২	১১	৩
১০০	৪	১০১	৫
১১০	৬	১১১	৭
১০০০	৮	১০০১	৯
১০১০	১০		

বাইনারি পদ্ধতিতে যোগ করার নিয়ম নিচের সারণীতে দেখাতে হলো।

সারণী

+	০	১
০	০	১
১	১	১০ (শূন্য এবং হাতে ১)

লক্ষ্য করা দরকার যে ১ এবং ১ যোগ করে হয় শূন্য এবং হাতে ১। এভাবে দুটো বাইনারি সংখ্যার যোগ নিচে দেখানো হলো :

বাইনারি	দশমিক
১০১	৫
১১১	৭
১১০০	১২

এখানেও লক্ষ করা দরকার যে আমরা বাইনারি যোগ ১+১+১ সমান ১১ লিখেছি কেননা ১+১ সমান ১০ এবং ১০+০১ সমান ১১। একইভাবে বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায়, কিন্তু এসব নিয়ম এখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

বাইনারি সংখ্যার একটি বিশেষ নাম আছে শূন্য এবং এক। ওই সংখ্যা দুটোর প্রত্যেকটিকে বলে বিট। ইংরেজি 'বাইনারি' শব্দের অক্ষরটি নিয়ে করা হয়েছে 'বিট'। বিট হলো তথ্যের মৌলিক একক। কম্পিউটারে যে মৌলিক যুক্তিভিত্তিক দুটো বিকল্প পথের কথা বলা হয়েছে তারই রূপ দেওয়া হয় বিটের মাধ্যমে।

অবশ্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরে দশমিক সংখ্যাকে সরাসরি বাইনারি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হয় না। তথ্য আর কর্মসূচির নির্দেশমালা দেওয়ার জন্যে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে 'কোড' বা সংকেত-লিপি। সংখ্যাকে রূপায়ন করার জন্যে যে পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত তাকে বলে 'বাইনারি কোডেড ডেসিমাল' বা 'বিসিডি'। উদাহরণস্বরূপ দশমিক সংখ্যা ২৯.৩ নেয়া যায়। যেহেতু দশমিক পদ্ধতির ২,৯ এবং ৩ বাইনারি পদ্ধতিতে বিসিডি পদ্ধতিতে লেখা হয় ০০ ১০ ১০০ ১ ০০ ১১। এখানে চারটি করে সংখ্যা দিয়ে বাইনারি দৈর্ঘ্য আগেই ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রকৌশলী কাজে 'বাইনারি' শব্দের একটা সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকা দরকার। কম্পিউটারে সঞ্চয়ী যন্ত্রাংশগুলো এমনভাবে তৈরি যে তাদের মধ্যে ২৪, ৩২ অথবা ৬৪টি বিট থাকতে পারে। যেমন আইবিএম-এম সিস্টেম ৪৩৩১ কম্পিউটারে শব্দ-দৈর্ঘ্য হলো ৩২ বিট। কম্পিউটারে তথ্যের মৌলিক একককে বলে বাইট। চারটি বাইট নিয়ে একট শব্দ যার মধ্যে পরপর ৩২টি বিট থাকে।

কম্পিউটারের সংখ্যা-ভিত্তিক তথ্য দেওয়া হয় সাধারণত : ১. বাইনারি কোডেড ডেসিমাল, ২. নির্দিষ্ট বিন্দু, অথবা ৩. ভাসমান বিন্দু পদ্ধতিতে। প্রথমে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এখানে কোনো দশমিক বিন্দু থাকে না। তাই দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করতে হয়। বেশির ভাগ কম্পিউটারে একট নির্দিষ্ট শব্দ-দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়। যেহেতু কম্পিউটারে একই গণনার বিভিন্ন অংশ সমান্তরালভাবে করা সম্ভব, তাই নির্দিষ্ট বিন্দু গণিতে খুব দ্রুত কাজ করা যায়। যেসব কম্পিউটারে শব্দ-দৈর্ঘ ৩২-বিটের সেগুলোতে ২৩১ থেকে ২৩২-১ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা ব্যবহার করা যায়। ওই দুই সীমানার বাইরে গেলে কম্পিউটার বলে দেবে যে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যার উদ্ভব হয়েছে।

কিন্তু অনেক কাজে এর চেয়ে বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হয়। তা ছাড়া পূর্ণ সংখ্যা এই নিয়ে কাজ করলে ভগ্নাংশের জন্য উপযোগী সংকেতের প্রয়োজন হয়। এ অসুবিধা দূর করার জন্যে ভামনা-বিন্দুর সংখ্যা পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করে থাকি। তৃতীয় পদ্ধতিতে ২৯.৩ সংখ্যাটিকে লেখা হয় + ০.২৯৩X১০২। কম্পিউটারে শব্দ-দৈর্ঘ্য যদি দশ হয় তবে এ সংখ্যাটি + ২৯৩০০+০২ অর্থাৎ দশমিক চিহ্ন আর যোগ চিহ্ন সহ মোট দশ ঘর নেওয়া হয়। শেষের দুটি সংখ্যা ০২ হলো আমাদের নির্দিষ্ট রাশির সূচক অর্থাৎ ১০-এর ঘাত। এই সূচকটি-৯৯ থেকে + ৯৯ পর্যন্ত হতে পারে। লক্ষ্য করা দরকার যে দশমিক-বিন্দু প্রথম

তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যার (অর্থাৎ ২-এর) ঠিক বামে আছে এটা আগে থেকেই স্থির করে নেওয়া হয় এবং সব রাশি এভাবেই প্রকাশ করতে গিয়ে প্রয়োজনমতো সূচক সংখ্যা দুটি পরিবর্তন করে নিতে হয়।

বাইনারি পদ্ধতিতে যোগ বিয়োগ গুণ-ভাগের পাটিগণিত ছাড়াও বীজগণিতের কাজ করা যায়। এ বীজগণিতের নাম সাংকেতিক যুক্তিশাস্ত্র যার আবিষ্কর্তা জর্জ বুল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী শ্যানেন সাংকেতিক বীজগণিতের বহুমুখী উপযোগিতা প্রমাণ করেন। এবং তারপরে তা আরও উন্নত করে। কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

বাইনারি বীজগণিতের পরবর্তী রাশির মান হলো দুটো। এ বীজগণিতের অনেক নিয়ম আছে যার মধ্যে প্রধান হলো : 'এবং' 'অথবা' 'না'।

ইংরেজিতে 'এন্ড', 'অর' এবং 'নট'। এগুলির সংজ্ঞা এ রকম :

১. এবং এটা একটা সাংকেতিক কাজ, যার অর্থ হলো—যদি ক একটা বক্তব্য আর খ দ্বিতীয় আর একটা বক্তব্য হয় তবে "ক এবং খ" সত্য হবে যদি দুটো বক্তব্যই সত্যি হয় আর মিথ্যা হবে যদি দুটো বক্তব্যই মিথ্যা হয়। "এবং" কাজ বাস্তবায়ন করা যায় বৈদ্যুমিক রিলে বা সুইচ দিয়ে। "এবং" কাজটা লেখা হয় এভাবে, গ=ক. খ। অর্থাৎ ফোটা সাংকেতিক "এবং" কাজ বোঝায়। "এবং" কাজের যন্ত্রকে "এন্ডগেট" বা "এবং দ্বার" বলা হয়।

২. অথবা, এটাও একটা যৌক্তিক কাজ যার অর্থ হলো—ক একটি বক্তব্য আর খ দ্বিতীয় একটি বক্তব্য হয় তবে "ক অথবা খ" সত্য হবে যদি অন্তত একটি বক্তব্য সত্য হয় আর মিথ্যা হবে যদি উভয় বক্তব্য মিথ্যা হয়। "অথবা কাজকে গ= ক+ খ এভাবে লেখা হয় কেননা যোগের চিহ্ন এ বীজগণিতে অথবা অর্থ বহন করে।

৩. না : এটিও একটি যৌক্তিক কাজ যা দিয়ে বলা হয়—যদি ক একটি বক্তব্য তাহলে "ক–না" একথা সত্য হয় যখন ক মিথ্যা আর মিথ্যা হয় যখন ক সত্য। না কাজকে বিপরীত কাজও বলা হয়ে থাকে।

মাল্টিমিডিয়া

কম্পিউটারের এগিয়ে চলা ইনেটেলের অতি ক্ষুদ্র দ্রুততর ট্রানজিস্টর সম্প্রতি ইন্টেল করপোরেশন ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অতি ক্ষদ্রাকৃতির দ্রুতগতের ট্রানজিস্টার তৈরি করবে। আর এ ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য তারা বেশ এগিয়ে গেছে। ইন্টেল জাপানের বাণিজ্য সম্মেলনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও দ্রুত গতিসম্পন্ন ট্রানজিস্টর প্রদর্শন করেছে। তাদের প্রদর্শিত এই ট্রানজিস্টরের দৈর্ঘ্য মাত্র ২০ ন্যানোমিটার। আর এক ন্যানোমিটার হচ্ছে ১ মিটারের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কতটুকু ক্ষুদ্রাকৃতির এই ট্রানজিস্টরটি। ইন্টেলের

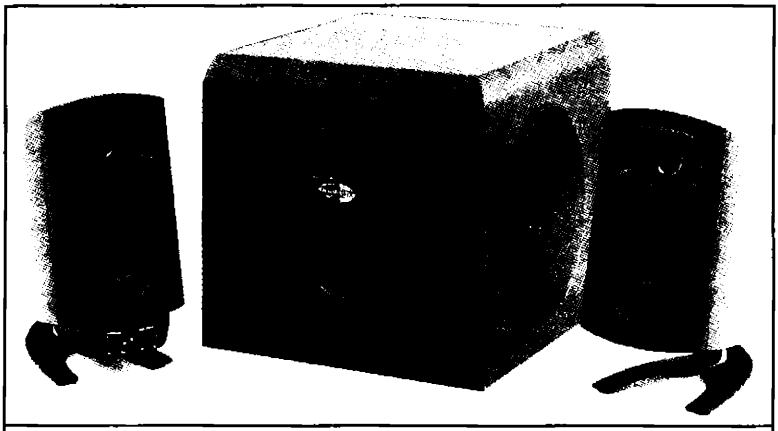

Speaker - স্পিকার

বিশেষজ্ঞ গবেষকরা জানিয়েছেন, তাদের প্রদর্শিত নতুন এই ট্রানজিস্টরটি বর্তমানে প্রচলিত ট্রানজিস্টরের চেয়ে ৩০% ছোট। আর গতিতেও এটি ২৫% এগিয়ে এখনকার প্রচলিত ট্রানজিস্টরগুলোর চাইতে। ইন্টেল আশা করছে এই ট্রানজিস্টরটি চিপকে বৈপ্লবিক উন্নতিপর্বে নিয়ে যাবে। কেননা ট্রানজিস্টর হচ্ছে চিপের মূল উপাদান।

জাপানের 'সিকো এসইয়ার্ড কোং-এর এক কর্মকর্তা টোকিওয়ে তাদের অফিসে নতুন ক্ষুদ্রাকৃতির একটি মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ার দেখিয়েছেন এই মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ারের ৪ ধরনের কার্যকারিতা রয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে টিভি দেখা যাবে, এফএম ব্যান্ডে রেডিও শোনা যাবে, ডিজিটাল ইমেজ দেখা যাবে ও ডিজিটাল অডিও শোনা যাবে। এ মাল্টিমিডিয়া জাপানে ৪১৬ মার্কিন ডলারে বিক্রি হচ্ছে।

ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট

আমাদের এই বিচিত্র সমগ্র বিশ্বে রয়েছে শত শত রকমের ভাষা। পৃথিবীর একেক দেশের ভাষা একেক রকম। পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকের ভাষা অন্য প্রান্তের লোকদের কাছে দুর্বোধ্য। আবার এমনও দেশ আছে যেখানে একই সঙ্গে কয়েক ধরনের ভাষা প্রচলিত যেমন : ভারত বা পাপুয়া নিউ গিনি। এসব দেশের এক অঞ্চলের লোকের অন্য অঞ্চলের লোকদের ভাষা বুঝতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। আর ভাষার এই বিভিন্নতা পর্যটকদের জন্য একটি রড় রকমের সমস্যা। আর পর্যটকদের ভাষা না জানার কারণে বিদেশে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান এখন পাওয়া যাবে ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত নামক ওয়েব সাইটে। ভাষাসংক্রান্ত চমৎকার, কার্যকরী এই সাইটটিতে ৬০টিরও

অধিক ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে প্রতিটি ভাষার শব্দসম্ভার, প্রয়োজনীয় বাক্য এবং এসব বাক্যের যথাযথ অনুবাদ। ক্যাটালগ ও হাইওয়াইআনের মতো ভাষাও রয়েছে ওয়েব সাইটের আলোচনার মধ্যে। যেসব শব্দ ও বাক্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো ইচ্ছে করলে যেন ওয়েব সাইটিটি থেকে শুনতে পাওয়া যায়, সে ব্যবস্থাও রয়েছে এই ওয়েব সাইটটিতে। যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র রকমের সব ভাষা জানতে, শিখতে আগ্রহী তাদের জন্য এই ওয়েব সাইটটি একটি আদর্শ ওয়েব সাইট। কারণ প্রতিটি ভাষার শব্দ ভার ও অতিপ্রচলিত বাক্যগুলো এই ওয়েব সাইট থেকে একই সঙ্গে জানতে এবং উচ্চারণ শুনতে পারা যায়। এ কথায় ভাষা শিক্ষক ওয়েব সাইট বলা যায় এ ওয়েব সাইটিকে। এ ওয়েব সাইটটি অতি প্রয়োজনীয়।

পকেট পিসি। Pocket PC

ইদানীং বিশ্বে পকেট পিসির কদর বেড়েছে। কয়েকটি উন্নত দেশে এই পিসি ব্যাপক বিক্রি হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা যায়, শুধু মাইক্রোসফটাই এ ধরনের যন্ত্র বিক্রি করছে। ১.২৫ মিলিয়ন। এ কোম্পানিটি গত বছর মাঝামাঝি সময়ে পকেট পিসি বাজারে আনে। পকেট পিসি কেমন বিক্রি হবে বা এর বাজার কেমন চলবে তা নিয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কিন্তু সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে এর ব্যাপক হারে বিক্রির কারণে। মাইক্রোসফটের পকেট পিসি ছাড়াও আরো বেশি কয়েকটি কোম্পানির পিসি বাজারে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। এইচপি'র পিডিএ-জরনাডা এবং ক্যাসিও পকেট পিসিও বেশ বিক্রি হচ্ছে। মাইক্রোসফট সনি, কম্প্যাক ক্যাসিও ও এইচপি'র ইন্টারনেটে সুবিধাসহ ছোট আকারের এই পিসি'র কাছে পুরনো কোম্পানিগুলো মার খেয়ে যায়। কারণ এরকম সুবিধা তারা দিতে পারে নি। মাইক্রোসফট পকেট পিসি'র আরো বাল অপারেটিং সিস্টেম আবিষ্কারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এটা করতে পারলে তাদের কাটতিওবেড়ে যাবে বলে তাদের ধারণা। মাইক্রোসফট তাদেরপকেট পিসিতে এখন সিমিং অডিও এবং ভিডিও প্লেয়ারও সংযোজন করেছে। তাই দিনদিন পকেট পিসির চাহিদা বাড়ছে।

উইন্ডোজ এক্সপি? । Windos XP

কিছুদিন আগে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর মাইক্রোসফট করপোরেশন তাদের নিজেদের ভাষায় উইন্ডোজ '৯৫ এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম 'উইন্ডোজ এক্সপি' এবং 'লুনা' নামের নতুন ইন্টারফেসের বেটা প্রদর্শন করেছে। মাইক্রোসফট চেয়ারম্যান বিল গেটস এ বেটা সংস্কারণ প্রদর্শন করেন।

মাইক্রোসফট যদিও গত বছর থেকে আসছে বহুল আলোচিত ডট নেট প্লাটফর্মের মধ্যমণি হবে উইন্ডোজ এক্সপি। তবে বেটা প্রদর্শন অনুষ্ঠানে ডট নেটের অন্তর্ভুক্ত

খুব সামান্য ক'টি বৈশিষ্ট্যই দেখিয়েছে মাইক্রোসফট। পরিবর্তে নতুন ইন্টারফেস লুনা অনলাইন শপিং, ওয়েবে ছবি প্রকাশ এবং ইন্টারনেটে অ্যাপ্লিকেশন বিনিময়ে কিভাবে ব্যবহারকারীদের সাহায্য করবে এটাই প্রদর্শন করেছে মাইক্রোসফট। উইন্ডোজ এক্সপি'তে থাকবে দুটি ইন্টারফেস। লুনার পাশাপাশি ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজ ইন্টারফেসও ব্যবহারের ধারণাই পাল্টে যাবে-বিল গেটসের এই অতি আশাব্যঞ্জক বক্তব্যের সঙ্গে প্রদর্শিত বেটা সংস্করণের সঙ্গে জড়িত টেস্টাররা বলছেন এখনো পর্যন্ত সর্বশেষ বাজারজাতকৃত উইন্ডোজ মিলেনিয়াম এডিশনের তুলনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো উন্নয়ন তারা এটাতে পায় নি।

দেশী সফটওয়্যার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অমর ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভিত্তি করে কয়েকজন তরুণ মিলে তৈরি করেছেন মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার আন্তর্জাতিক অমর একুশে। এতে আছে ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সে সময়কার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিক খবরের অনুলিপি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের অনুলিপি, ভাষা আন্দোলনের স্থিরচিত্র, ভাষার গান, ভাষা-সৈনিকদের সাক্ষাৎকার, ভাষা-শহীদদের তালিকা, ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতসহ ভাষা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানমালার ভিডিও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিত ও বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস। এটির উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় দিকের মধ্যে আছে বেশ কিছু দুর্লভ ফটো, দুর্লভ দলিলপত্র, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল লতিফের কণ্ঠে ভাষার গান, বঙ্গবন্ধুর সমকালীন ভাষা দিবস উদযাপনের ভিডিও (১৯৭২), ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দৈনিক পত্রপতিকায় বিশেষ করে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত খবরের পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি, ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এবং অর্জনের ওপর ভাষা-সৈনিক গাজীউল হকের সাক্ষাৎকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষার ওপর আগ্রাসন বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ ড. রফিকুল ইসলাম এবং ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সাক্ষাৎকারও রয়েছে। এটি বাজারজাত করেছে প্রোটিয়াস সফটওয়্যার (প্রা.লি.)।

নতুন প্রোটন বিম

কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরের দ্য নাশনাল ইউনির্ভাসিটি অভ সিঙ্গাপুরর রিসার্চ সেন্টার জানিয়েছে, উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ নির্মাতারা খুব শিগগিরই প্রোটন বিম-এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির সার্টির্ক তৈরি করতে সক্ষম হবে। সিঙ্গাপুরের ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ গতিসম্পন্ন ওই প্রোটন বিম-এর ব্যাপারে বেশ আশাবাদী। বিজ্ঞানীরা অবশ্য ওই প্রোটন বিমের বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারের জন্য গত ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে আশার আলোর দেখা পায় সিঙ্গাপুরের ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি। ওই প্রতিষ্ঠানের নিউক্লিয়ার মাইক্রোস্কোটি

বিভাগ প্রোটন বিম উদ্ভাবনে সফলতার মুখ দেখে। অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ওই প্রোটন বিমের মাধ্যমে তারা মানব কোষের ব্যাসের ১ হাজার ভাগের ১ ভাগ মাপ বের করতে সক্ষম হয়েছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গবেষক এবং এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর ফ্রাঙ্ক ওয়াট জানান, 'যে পদার্থের পরমাণু ইলেক্ট্রনিক কাঠামোর প্রভাবে নতুনভাবে সজ্জিত হবে। আর একটি সংশ্লিষ্ট পদার্থের কিছুটা ক্ষতিসাধন করলেও ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্রাংশ তৈরিতে সহায়ক হবে। আর গবেষণা কেন্দ্রটি এখন প্রোটন বিমের পেটেন্ট করাবে ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতোদিন শুধু পরীক্ষামূলক ক্যান্সার থেরাপি এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এর ব্যবহার হতো। আর বিজ্ঞানীরা আশা করছেন ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্রাংশ তৈরিতে নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটাবে তাদের এই নতুন উদ্ভাবন। সেদিন বেশি দূরে নয়।

দৃষ্টিহীনদের ওয়েবসাইট

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা এখন আর যোগাযোগহীন থাকবেন না। দৃষ্টিহীন মানুষ যাতে পৃথিবী জুড়ে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন সেজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট সম্প্রতি প্রকাশ করছে ইন্দোনেশীয় সরকার। ওয়েবসাইটটিতে বর্তমানে শুধু ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।

ওয়েবসাইটটিতে বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। সাইটটিতে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ এবং কণ্ঠ শনাক্তকারী সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে যাতে দৃষ্টিহীন মানুষ সহজেই কণ্ঠ শুনতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। আর জর্জ নামের সফটওয়্যারটির কার্যকারিতায় গুণে যে কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কম্পিউটারও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন অতি সহজেই। জর্জ সফটওয়্যারটি ছবি, কম্পিউটারের বিভিন্ন কমাণ্ড এবং ছবিকে স্পষ্ট ইংরেজি শব্দে রূপান্তর করে ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করবে। ওয়েবসাইটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটিতে একটি অনলাইন ব্রেইল লাইব্রেরি, খবর এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য কাজ করছে এমন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলে সেই লিংকগুলোতে ক্লিক করলে আরো অনেক অজনা তথ্যও জানতে পারবেন অতি সহজে।

ভায়ার নতুন চিপ

কয়েকদিন পূর্বে চিপসেট ডিজাইনার ভাষা টেকনোলজিস 'ভাষা সিথ্রি' নামের নতুন প্রসেসর বাজারে ছেড়েছে। নতুন চিপটির গতি হচ্ছে ৭৩৩ মেগা হার্টজ। প্রসেসরগুলোর আকার ছোট হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচও কম পড়ছে। স্বল্প মূল্যের কম্পিউটার বাজারে আধিপত্য স্থাপনের লক্ষে ভায়া এই প্রসেসর তৈরি করছে।

এ.এম.ডি'র নতুন চিপসেট

বাজারে আসছে এএমডি'র নতুন চিপসেট। এ চিপসেট কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাথলনের সঙ্গে দ্রুতগতির ডিডিআর ডির‍্যাম সংযুক্তির সুবিধা দেবে। যদিও এ বছরে চিপসেটের সরবরাহ থাকবে খুবই কম তবুও একটি বৃহৎ কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নতুন চিপসেট ও অ্যাথপন প্রসেসরসহ কম্পিউটার বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ চিপসেট অ্যাথলনের বাস স্পিডকে ২০০ মেগাহার্টস থেকে ২৬৬ মেগাহার্টজে উন্নীত করতে সহায়তা দিবে।

লাভ বাগের নতুন রূপ

লাভ বাগ কম্পিউটার ভাইরাসের ধ্বংসযজ্ঞের পাঁচ মাস পরেও ভাইরাসটির নতুন নতুন রূপ আক্রমণের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। লাভ বাগের সর্বশেষ রূপটি নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে কিন্তু ধ্বংস করার ক্ষমতার দিক থেকে পূর্বসুরির চেয়ে পিছিয়ে নেই। লাভ বাগের নতুন রূপটি ই-মেইলের শিরোনামে হিসাবে 'US president and FBI Secrects' নামে আবির্ভূত হচ্ছে। অ্যান্টিভাইরাস প্রতিষ্ঠান ম্যাকাঠিগ এবং ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান সপোস ভাইরাস হান্টাররা বলছেন, সর্বশেষ রূপটি তেমন ক্ষতিকারক নয়। গত মে লাভ বাগ লাভ ইউ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর এটা হচ্ছে ৪৪ তম রূপ। মে লাভ বাগ লাইরাস সারা বিশ্বের কম্পিউটার সিস্টেমে আঘাত করেছিল এবং এর ফলে ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

নতুন রোবোডগ

রোবোটিক প্রাণী পোষা ও যুগের শখ। অবশ্য এসব প্রাণী তো আর দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত পোষা হয় না। এরা যান্ত্রিক প্রাণী বলে ভেতরে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। ব্রিটিশ ফার্ম 'বোবোসায়েন্স' সম্প্রতি এমনি এক পোষা কুকুর বানিয়েছে, যা এ ধরনের প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী বটে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'আরএস-০১'। ওজন বারো কেজি। যে কোনো শিশুতে পিঠে তুলে নিতে পারে সে। আর এটাই এর একমাত্র গুণ নয়, আরো আছে। এ রোবোডগ বাধা ডিঙ্গাতে পারে, গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে পারে, হাতে নানা জিনিস নিতে পারে, প্রায় ৬০টি মৌখিন নির্দেশনা মেনে চলতে পারে। দুপায়ে কাজ করে সে। প্রথমত স্বয়ংসম্পূর্ণ উপায়ে, যার সাহায্যে তার সাইবারডপি মস্তিষ্ক স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দ্বিতীয় উপায় হলো 'এক্সপ্লোয়ার' অর্থাৎ কণ্ঠস্বর বা পিসি'র সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় সে। সুতরাং এটি হাইটেক খেলনায় চেয়েও বেশি কিছু। মাইন পরিষ্কার করার মতো বিপজ্জনক সামরিক কাজও সে পারে। সফটওয়্যার হিসাবে মাইক্রোসফট উইন্ডোজে চলে এটি। তারবিহীন ইন্টারনেট যোগাযোগের সাহায্যে যে কেউ তাঁর ই-মেইলে এর কণ্ঠ শুনতে পারেন। অর্থাৎ এটিকে রিমোট

কন্ট্রোল গার্ডডপ হিসেবে কাজ করাতে পারবেন। কারণ ওয়েবে এর একটি ভিডিও ক্যামেরা চোখ রয়েছে। এতো গুণের জন্যই এটি খুব সস্তা নয়, দাম প্রায় ২৯ হাজার ডলার।

কম্পিউটারের অন্যান্য তথ্য

চিপ কীভাবে তৈরি হয়

আমরা জানি চিপ তৈরি হয় সিলিকন দিয়ে। চিপ বা মাইক্রোচিপ সিলিকনের ক্ষুদ্র একটি খণ্ড। এর ভেতর আছে লক্ষ কোটি ট্রান্সিস্টরগুলো প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ কোটি বার অন অফ অবস্থার মধ্যে আসা যাওয়া করে। কিভাবে ওই ক্ষুদ্র খণ্ডের মধ্যে এত এত বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি হয়। মিনিয়েচারাইজেশন বা ক্ষুদ্র করার প্রযুক্তিই আছে তার মূলে। চিপ আকারেহ আঙুলের নখের চেয়ে ছোট বা সমান। কম্পিউটারে ব্যবহৃত চিপ দু ধরনের হতে পারে। একটি মাইক্রোপ্রসেসর রূপে, অন্যটি মেমোরি রূপে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোপ্রসেসর প্রোগ্রাম নির্দেশ পালন করে। আর মেমোরি চিপ ও মেমোরি ও অন্যান্য ডাটা ধরে রাখে। মাইক্রোপ্রসেসর বহু ধরনের যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। মেমোরি চিপের ব্যবহৃত মূলত কম্পিউটারেই সীমাবদ্ধ। সিলিকন আমরা জানি আধা-পরিবাহী। সাধারণ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ সিলিকন বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে। না তবে তাতে খাদ মেশালে সেটি সুপরিবাহী হতে পারে। বিজ্ঞানীরা সিলিকনে বোরন এবং ফসফরাস মিশিয়ে এ কাজটি করেন। যে সব জায়গায় খাদ মেশানো হয়, সে সব জায়গায় বিদ্যুৎ সংকেত তৈরি করা যায়। এভাবে চিপের মধ্যে কোনোটি হয় ট্রান্সিস্টর, কোনোটি ক্যাপাসিটর, কোনোটি ডায়োড, কোনোটি রেজিস্টর। ট্রান্সিস্টরকে বৈদ্যুতিক স্যুইচ বলা যায়। ক্যাপাসিটর

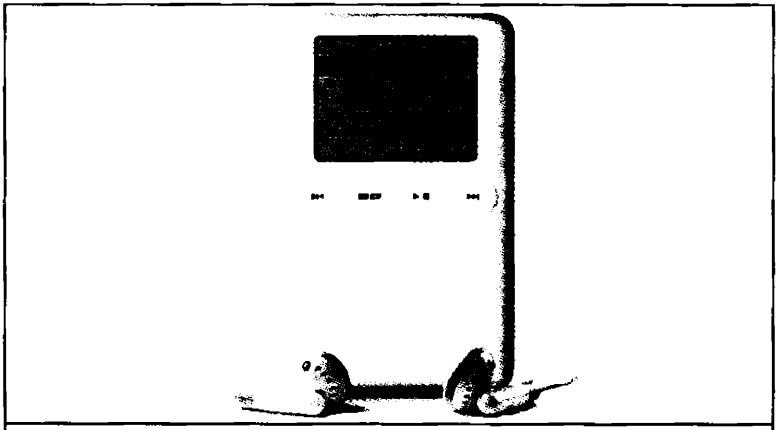

I-Pod - আই পড

বৈদ্যুতিক আধার বা চার্জ জমা রাখতে পারে। ডায়োড বিদ্যুকে কোনো একদিকে যেতে বাধা দেয়। আর রেজিস্টর জমা রাখে ভোল্টেজ। এভাবে যে সকল ছোট ছোট অংশ তৈরি হয়, তার কোনো কোনোটির দৈর্ঘ্য একমাইক্রোমিটার বা এক মিলিটারের ১ হাজার ভাগের ১ ভাগেরও কম। এগুলোকে সংযুক্ত করা হয় সাধারণ এলুমিনিয়ামের সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে।

এ চিপের সাথে বাইরে সংযোগ দানের জন্য ছোট একটি কাঠামো ব্যবহার করা হয়, যার মাপ ২ ইঞ্চির মতো। দুধারে থাকে অনেকগুলো পিন। এর নাম ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ বা ডিপ। এ পিনগুলো তারের সাহায্যে চিপের অভ্যন্তরে সংযোগ রক্ষা করে। এ প্যাকজটিকেই সার্কিট বোর্ড স্থাপন করা হয়।

বিট, বাইট ও ওয়ার্ড। Bit, Byte & Word

কম্পিউটারে ডাটা রাখা হয় বাইনারি সংখ্যা রূপে। বাইনারি বা দ্বিপদী নিয়মে সংখ্যা মাত্র দুটি। এক আর শূন্য। ফলে দুটি মাত্র সংখ্যাই ওই দুটির কম্বিনেশন বা বিন্যাস থেকে পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, কম্পিউটার বিদ্যুতের সংকেতকে বিশ্লেষণ করেই ওগুলোকে চেনে। এ দুটি সংখ্যাই কম্পিউটারকে কত ক্ষমতাবান করেছে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দুটি সংখ্যার সীমাবদ্ধতাকে আসলে অতিক্রম করা যায়। ওই দুটি সংখ্যাকে পাশাপাশি বাড়ানো যায়। যেমন : ওগুলোকে দু ঘরে লিখে ০০,০১ ১০ এবং ১১ পাওয়া যায়। তিন ঘরে লিখলে ০০০,০০১ ০১১, ১০০, ১০১, ১১০, ও ১১১ ওই ৮টি সংখ্যা পাওয়া যায়। কম্পিউটারে এরকম এক একটি ঘরকে বিট নামে আখ্যায়িত করা হয়। এভাবে প্রতিবার একটি হকরে বিট বাড়িয়ে সংখ্যা গঠনের মাত্রা বাড়ানো সম্ভব। আটটি বিট ব্যবহার করে পাওয়া যায় ২৫৬ টি সম্ভাব্য বিন্যাস। এ সবই দুয়ের গুণিতক। এই ৮ বিটকে কম্পিউটারের ভাষায় বলে 'বাইট'। এতে আছে শূন্য ও একের ২৫৬টি বিন্যাস বা ২৫৬ বাইট। আসলে মাত্র ৭টি ঘরই হরফের জন্য ব্যবহার হয়। অতিরিক্ত ঘরটি ব্যবহার করা হয় ডাটার সংহতি পরীক্ষার জন্য। ওই অতিরিক্ত ঘরটিকে বলে প্যারিটি। ওই ২৫৬টি বাইটের প্রতিটিকে বর্ণমালার বর্ণ প্রতিস্থাপন করা যায়। সেক্ষেত্রে ভেতর সব কটি ইংরেজির বর্ণ সহ সংকেত চিহ্ন ও সংখ্যা সংকুলান করা সম্ভব হয়। আসলে ১২৮টি ঘরই বর্ণমাল ও অন্যান্য চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাদ বাকি ১২৮টি সংরক্ষিত থাকে গ্রাফিকসের প্রয়োজনে।

বায়োস। BIOS

'বায়োস' শব্দটি 'বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম' এর সংক্ষিপ্তরূপ। ১৯৯৯-এর এপ্রিলের ২৬ তারিখের কথা অনেকের মনে আছে। সেদিন চেরনোবিল ভাইরাস আক্রমণ করেছিল বায়োসকে। বদলে দিয়েছিল তাতে লেখা নির্দেশগুলো। ফলে

সেটি অর্থহীন শব্দরাজি বা আবর্জনায় পরিণত হয়। কাজের সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশ খুজে না পেয়ে বিকল হয়ে যায় হাজার হাজার কম্পিউটার। বায়োস যে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তার নমুনা এ থেকেই পাওয়া যায়। বিশেষ উপায়ে এমনকি, ইন্টারনেট থেকে বায়োস ফাইল সংগ্রহ করে অনেকের ফাইল মেরামত করতে হয়েছিল।

বায়োস কিছু ইনস্ট্রাকশন সেট বা নির্দেশের সমষ্টি। এটি 'রম' বা 'রিড ওনলি মেমোরি'র পর্যায়ভুক্ত। এতে আছে কিছু তথ্যও। কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগ দানের সঙ্গে সঙ্গে বায়োসই প্রথম কাজ শুরু করে। এটি প্রথমে পরীক্ষা করে কম্পিউটারের সকল হার্ডওয়ার বা যন্ত্রাংশ। একে বলে পোস্ট বা পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট। যন্ত্রাংশগুলো ঠিক মতো আছে কিনা বা কাজ করছে কিনা তাই এর মাধ্যমে দেখা হয়। এ পরীক্ষার নামে মেমোরি সেলফ টেস্ট। যত মেগাবাটি র‍্যাম আছে, দ্রুত তা পরীক্ষা ফলাফল মনিটরে প্রদর্শিত হতে থাকে। যাই হোম, এ কাজ শেষ হলে বায়োসে দেখে এ (A) ড্রাইভে কোনো বুটেবল ফ্লপি আছে কিনা। না থাকলে, বায়োস হার্ড ডিস্কে অপারেটিং সিস্টেম খুঁজে বের করে এবং কম্পিউটার পরিচালনার ভার অপারেটিং সিস্টেমের উপর ছেড়ে দেয়। অপারেটিং সিস্টেমের উপর থাকলেও সফটওয়্যারের নির্দেশ অনুযায়ী বাযোস বিভিন্ন ইনপুট ও আউটপুট হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে। এছাড়া প্লাগ এন্ড প্লে ও পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কাজগুলো করে থাকে।

বায়োস বিশেষ বিশেষ সিপিইউ'র সাথে সংগতি রেখে তৈরি করা হয়। ফলে এক প্রসেসরের জন্য তৈরি বায়োস অন্য প্রসেসরে চলে না। এ কারণে কম্পিউটার পরিচালনা সমস্যা বিরাজ করে। কোনো কোনো যন্ত্রাংশের নিজস্ব বায়োসও থাকে। উইন্ডোজ বায়োস রুটিনের অনেকগুলো এড়িয়েও যেতে পারে। তার ফলে কম্পিউটার রিয়েল মোডে চালু হয়। ওই মোডে ডিভাইস ড্রাইভার বা যন্ত্র যথাযথভাবে সক্রিয় হয় না। হার্ডওয়্যার সমস্যা সমাধানের জন্য এ মোডকে কাজে লাগানো যায়। অন্যান্য সময়ে উইন্ডোজ প্রটেক্টেড মোডে চলে। বিভিন্ন হার্ডওয়্যারের প্লাগ এন্ড প্লের সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য বায়োসের ধরণ বদলে যাচ্ছে। তা নতুন করে লিখতে হচ্ছে।

বায়োসের বিশেষ প্রকৃতির কারণে এটা কি হার্ডওয়ার নাকি সফটওয়ার এ নিয়ে বির্তক আছে। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের বিভাজন করা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে যায়। যেমন : কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসেসর নিজেই গাণিতিক কাজ করে। আবার অন্য সময় তা হয় সফটওয়্যারের নিয়ন্ত্রণে। বায়োসের সফটওয়্যার স্থায়ীভাবে হার্ডওয়্যারের মধ্যেই থাকে। এ দুটিকে পৃথকভাবে সম্ভব নয়। তাই এ ধরনের যন্ত্রাংশগুলোকে 'ফার্মওয়ার'ও বলা হয়। এ কারণে সিপিইউও ফার্মওয়াররূপে গণ্য হয়ে থাকে।

সফটওয়্যার

প্রত্যেকটি কম্পিউটারকে কাজের ক্ষমতা প্রদান করে সফটওয়্যার। সফটওয়ার ছাড়া কম্পিউটারটি তাৎপর্যহীন। সফটওয়্যার একটি প্রোগ্রাম বা কিছু নির্দেশের সমষ্টি। আমাদের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ সাধন করে সফটওয়্যার। ইনপুট বা নির্দেশ দিয়ে ব্যবহারকারী এসব সফটওয়্যার থেকে প্রয়োজন অনুসারে কাজ আদায় করতে পারে। সারকথা, সফটওয়্যার আছে বলেই কম্পিউটার আমাদের চাহিদা পূরণ করে। সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার কিছু যন্ত্রের সমাহার মাত্র। আর কিছু নয়।

কম্পিউটারে প্রথম যুগে সফটওয়্যার বলতে কিছু ছিল না। এতে ভ্যাকুয়াম টিউবগুলোকে তারের সাহায্যে সংযুক্ত করা হতো। ওই সংযোগই নির্ধারণ করতো কম্পিউটার কি কাজ করবে। নতুন কাজের জন্য তারের সংযোগ খুলে নতুন করে লাগাতে হতো। তখন সেটা পরিগণিত হতো নতুন নির্দেশরূপে। পঞ্চাশের দশকে পাঞ্চড কার্ড ব্যবহার করে যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয় প্রোগ্রাম নির্দেশগুলো তখন পাঞ্চড কার্ডেই থাকতো। দ্রুত গতির স্টোরেজ মাধ্যমগুলো আসার পর সে অবস্থারও পরিবর্তন সাধিক হয়।

সফটওয়্যার দু' ধরনের। সিস্টেম সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সিস্টেম সফটওয়ারকে সাধারণভাবে অপারেটিং সিস্টেমও বলে। তবে অপারেটিং সিস্টেম ছাড়াও ইউটিলিটি সফটওয়ার, ডাটা রিকভারি সফটওয়্যার ইত্যাদিও সিস্টেম সফটওয়্যারের আওতায় পড়ে। বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটারের বহু অপারেটিং সিস্টেমের প্রচলন হয়েছে। যেমন : ইউনিক্স, ডস, উইন্ডোজ, লিনাক্স ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বহু অপারেটিং সিস্টেম হারিয়েও গেছে। কিছু কিছু টিকতে পারে নি। বেশির ভাগ পিসিতে এখন উইন্ডোজই ব্যবহৃত হয়টি মাইক্রোসফট কোম্পানির তৈরি। পিসিতে অ্যাপলও জনপ্রিয়। তার অপারেটিং সিস্টেমের নাম 'ম্যাক ওএস'। সম্প্রতিকালে লিনাক্স কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষাকে অবলম্বন করে এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পৃথক পৃথক জাজের জন্য আছে পৃথক পৃথক এপ্লিকেশন সফটওয়্যার। আবার প্রোগ্রামিং ভাষা বা এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ভিত্তিতেও নির্দিষ্ট কাজের জন্য সফটওয়্যার বানানো যায়। এগুলোকে বলে 'কাস্টমাইজড সফটওয়্যার'।

এপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে প্যাকেজ সফটওয়্যার নামেও অভিহিত করা হয়। এপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলোর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটি এই যে, অপারেটিং সফটওয়্যারের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এগুলো তৈরি হয়। যে প্যাকেজ যে অপারেটিং পরিবেশের জন্য নির্মিত সে পরিবেশেই কেবল কাজ করে। অর্থাৎ এপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সঙ্গতি রেখেই তৈরি করা হয়। ওয়ার্ড ফর উইন্ডোজ শুধু উইন্ডোজ চলবে। ডসে চলবে না। অ্যাপেলের জন্য

তার ভিন্ন সংস্করণ প্রয়োজন নেয়। দৈনন্দিন লেখালেখির কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করি ওয়ার্ডপ্রসেসর। তবে শুধু হরফ বা টেক্সটনিচয়, সেক্সটের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ছবি সংযোজন করে। এমন কি, ছবির সম্পাদনাও করা যায়, আঁকাও যায়। ফ্যাক্সের সুবিধা নিয়ে ফ্যাক্স পাঠানোর কাজটিও করতে পারে। পারে ইন্টারনেটে ওয়েব পেজে নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে পৌছাতে।

এক একটি সফটওয়ার তৈরি পরও সেগুলোর উন্নয়ন সাধনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। এর পেছনে বাণিজ্যিক কারণেও সেটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পুরনোটির সংস্কার করা না হলে নতুন পণ্য এসে পুরনো পণ্যের জন্য হুমকিও সৃষ্টি করতে পারে। যা হোক, নতুন সংস্করণের জন্য পৃথকভাবে দাম নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন সফটওয়ারের উন্নয়ন সাধন করা হয় পর্যায়ক্রমে। এভাবে উন্নয়ন সাধনের পর সেগুলোর ক্ষমতা বাড়ে, সুবিধাও বাড়ে।

কাজেই আগেরটির সাথে পরেরটির পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যকে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বড় ধরনের উন্নয়ন সাধন করা হলে পূর্ণ সংখ্যা আর সামান্য পরিবর্তন করা হলে সেটিকে দশমিক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন : ডস ৪ মানে চতুর্থ সংস্করণ। ইংরেজিতে একে 'ভার্সন' বলা হয়। মূল সংস্করণের সামান্য উন্নয়ন সাধন করা হলে পূর্ববর্তী পূর্ণ সংখ্যার সাথে দশমিক যোগ করা হয়। উইন্ডোজ প্রথম দিকে ১, ২, ও ৩ এ রকম নামে চিহ্নিত করা হতো। এখন সেগুলো ৯৫ বা ৯৮ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। জনপ্রিয় এপ্লিকেশনসমূহকেও এরকম সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন : কোরেলড্র ৮ ও ৯ ইত্যাদি।

সিস্টেম সফটওয়ার I System Software

সিস্টেম সফটওয়ার বলতে সাধারণভাবে অপারেটিং সিস্টেমকেই বোঝানো হয়। তবে ইউটিলিটি সফটওয়ার, ডাটা রিকভারি সফটওয়্যার ইত্যাদিও সিস্টেম সফটওয়্যারের আওয়াতায় পড়ে। অপারেটিং সিস্টেম বা ওএস কম্পিউটারকে ব্যবহার উপযোগী করে। কম্পিউটারের প্রথম যুগে অবশ্য অপারেটিং সিস্টেম ছাড়াই প্রোগ্রাম লেখা হয়েছে, কম্পিউটারকে কার্যকর করা হয়েছে। তা ছিল খুবই কঠিন। অপারেটিং সিস্টেমের অভ্যন্তরে আছে কার্নেল। এটিইওএসের মৌলিক কাঠামো। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইসকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মেমোরিকে বিভিন্ন সফটওয়ারের প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। অপারেটিং সিস্টেম যে কাজগুলো করে সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে : ১. প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা। ২. মেমোরির ব্যবস্থাপনা। ৩. ফাইলের ইনপুট/আউটপুট ব্যবস্থাপনা। ৪. ডিভাইস বা যন্ত্রসমূহের ইনপুট/ আউটপুট ব্যবস্থাপনা।

এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালানোর সামর্থ্য সৃষ্টি করা অপারেটিং সিস্টেমের বা ওএসের অন্যতম কাজ। অপারেটিং সিস্টেমের অভ্যন্তরে কার্নেলে এ উদ্দেশ্যে ফাংশন যুক্ত

থাকে। মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেমে এক একটি এপ্লিকেশন চালু করার পরই অপারেটিং সিস্টেম পুনরায় আরেকটি এপ্লিকেশন চালু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। জটিল একটি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে বিভিন্ন চালু এপ্লিকেশনের মধ্যে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে ব্যবহারকারী ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ যখন করছেন, তখন অন্য একটি ফাইল তিনি প্রিন্ট করতে পারেন, সেই সাথে ইন্টারনেট থেকে ফাইল ডাউনলোডসহ অন্য কাজও করতে পারেন।

মেমোরি ব্যবস্থাপনা অপারেটিং সিস্টেমের আর একটি মৌলিক কাজ। ওএসের দায়িত্ব হচ্ছে, বিভিন্ন চালু এপ্লিকেশন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত মেমোরির সংস্থান করা। ডস কাজ করতো রিয়েল মোডে। তাতে যেটুকু মেমোরি আছে, সবই একসাথে বণ্টিত বা ব্যবহৃত বলে গণ্য হয়, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। তার ঊর্ধসীমাও আছে। উইন্ডোজ কাজ করে প্রটেক্টেড মোডে। তাতে ভার্চুয়াল মেমোরির ব্যবহার করা হয়। যদি র‍্যামে যেটুকু আছে, তাতে কাজ না চলে তাহলে হার্ড ডিস্কের খালি জায়গাও ওএস ব্যবহার করতে পারে। চালু প্রোগ্রামের জন্য যে মেমোরির প্রয়োজন হয় না, সে মেমোরির উপর উইন্ডোজ সেই প্রোগ্রামকে হাত দিতে দেয় না।

ওএসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ফাইল সিস্টেম। বিভিন্ন ফাইলকে বিভিন্ন স্টোরেজ মাধ্যমে সঞ্চিত করে রাখতে হয়। ফাইলগুলোকে প্রয়োজনবোধে মুছতে হয়, ফাইল থেকে ডাটা আনা-নেওয়া করতে হয়। ফাইলে নামও বদলাতে হতে পারে। ওএস আরো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে এ ফাইলগুলোকে যে সব সেক্টরে রাখতে হবে, সেগুলো চিহ্নিত করতে হয়। সেই সাথে ড্রাইভ কন্ট্রোলার যাতে প্রতিটি সেক্টর থেকে সে ফাইল খুঁজে বের করে আনতে পারে, সে অনুযায়ী নির্দেশ সংযুক্ত করে রাখতে হয়। উইন্ডোজের ফাইল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে ভার্চুয়াল ফাইল এলোকেশন টেবল।

পিসি'র বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাও ওএসের দায়িত্ব। কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি প্রতিটি যন্ত্রাংশের গঠন ভিন্ন। সেগুলোর ভাষাও ভিন্ন। এগুলো ইনপুট-আউটপুটের যে চাহিদা দেয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ডিভাইস ড্রাইভারের সাহায্যে। এত সব কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার পরিচালনার বিষয়টি সম্পাদনা করে থাকে।

উইন্ডোজ I Windows

কম্পিউটারের ডস চালু থাকা অবস্থাতেই মাইক্রোসফট উইন্ডোজ বের করে। তবে প্রথমদিকে উইন্ডোজ পিসিতে জনপ্রিয় হতে পারে নি। কারণ পিসিতে গ্রাফিক এপ্লিকেশন চালানোর মতো পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল না। মাইক্রোপ্রসেসরের উন্নয়নের সাথে সাথে উইন্ডোজের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এখন শতকরা ৯০ ভাগ পিসিতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। পিসিতে এখন ডসকে প্রতিস্থাপন

করেছে উইন্ডোজ। ডস পরিবেশে একবারের একাধিক কাজ করা যেতো না। উইন্ডোজে একসাথে একাধিক কাজ করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একসাথে একাধিক কাজ করার নাম 'মাল্টিটাস্কিং'। ব্যবহাকারী এর মাধ্যমে একাধিক প্রোগ্রাম কাজ করার সুযোগ পান।

অপরদিকে ডস একসাথে একটিই এপ্লিকেশন চালাতে পারতো। তাতে যে ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয় তকে ক্যারাকটার ইউজার ইন্টারফেস বা কুয়ি। এতে কমান্ডকে লিখতে হয়। তার মানে মনেও রাখতে হয়। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বা গুয়ি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে লেখার বদলে মেনু, আইকন (দেখতে ছবি, আসলে বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার নির্দেশ), টুলবার ব্যবহার করতে হয়। তাই কমান্ডর মুখস্থ রাখতে হয় না। উইন্ডোজে মাউস ব্যবহার করতে করতে কাজ করা বেশ সুবিধাজনক। এদিকে সিপিইউ'র ক্ষমতা যেরকম বেড়েছে, তাতে জিউউআই বা গুয়ির কাজ করার ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এভাবে সিইউআই বা কুয়ি ভিত্তিক ডস তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। ইউন্ডোজ ডসের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী। ব্যবহাকারীর কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। ইংরেজিতে বলে 'ইউজার ফ্রেন্ডলি'। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর কাছে এটি বন্ধুসুলভ। উইন্ডোজ ব্যবহার করতে লাগে অনেক বেশি র‍্যাম, বড় আকারের হার্ড ড্রাইভ, ও হার্ড ড্রাইভে যথেষ্ট খালি জায়গা। অপরদিকে ডস ছোট অল্প ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হার্ড ডিস্কে কাজ করেছে। র‍্যামের চাহিদাও অতটা ছিল না। ১ মেগাবাইটের চেয়ে কমেই চলেছে (শুরুতে ৫১২ থেকে ৬৪০ কিলোবাইটেই চলত)।

উইন্ডোজ ১ম ভার্সন বের হয় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে। প্রকৃতপক্ষে ইউন্ডোজের ৩.১ ভার্সনই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ ভার্সানগুলোতে প্রথম যুক্ত হতো ডস। তার উপর ভিত্তি করেই উইন্ডোজ চালু হতো। উইন্ডোজ ৯৫ সীমিত মাত্রায় এবং উইন্ডোজ ৯৮ প্রায় পুরোপুরি ডসের উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলেছে। তবে ডসের প্রোগ্রাম চালানোর সুবিধা উইন্ডোজ আছে। গেমগুলোও খেলা যায়। উইন্ডোজ নেটওয়ার্ক উপযোগী।

উইন্ডোজ ৯৫ এর সাথে নেটওয়ার্ক সুবিধা বাড়ানো হয়। এতে আরো যুক্ত হয় ই-মেল, ভয়েস মেল, ফ্যাক্স, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সুবিধা। পিএনপি বা প্লাগ এন্ড প্লে-র মাধ্যমে বিভিন্ন হার্ডওয়ারের সংযোগ দানের সুবিধা দেওয়া হয়। এর আগে বিভিন্ন হার্ডওয়ার ডিভাইস বা যন্ত্রের সাথে অপারেটিং সিস্টেমের সমন্বয় সাধনের কাজটি ছিল জটিল। এক সময়, এমন কি প্রিন্টারের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব কোনো কোনো এপ্লিকেশন সফটওয়ার নিজেই গ্রহণ করতো। এখন অপারেটিং সিস্টেম সে কাজটি সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছে।

উইন্ডোজে ফাইল ব্যবস্থাপনায় ফ্যাট ৩২ ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্যাট মানে মাইল এলোকেশন টেবল। হার্ড ডিস্কে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়। বড়

হার্ড ডিস্কে ক্লাস্টারও বড় হয়ে যায়। ফলে ডিস্কে জায়গার অপচয় বেশি হয়। ফ্যাট ১৬ তে ফাইল সিস্টেম ২ গিগাবাইটের চাইতে বড় ফাইল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফ্যাট ৩২ এ সে সমস্যা নেই। ফ্যাট ১৬ তে প্রতিটি ক্লাস্টারের আকার বড়, ৩২ কিলোবাইট। কিন্তু ফ্যাট ৩২ এ ক্লাস্টারের আকার ছোট, মাত্র ৪ কিলোবাইট। ফলে ফ্যাট ১৬ তে একটি ১ কিলোবাইট আকারের ফাইলের জন্যও ৩২ কিলোবাইট স্থান প্রয়োজন হয়। তার তুলনায় ফ্যাট ৩২ এ ৪ কিলোবাইটই লাগে। তাই ডিস্ক স্পেস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফ্যাট ৩২ অধিকতর দক্ষ।

ম্যাক ওএস I Mac OS

অ্যাপল কম্পিউটারের বাণিজ্যিক নাম 'ম্যাক'। এতে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমের নাম 'ম্যাক ওএস'। বর্তমানে এর ৯ম সংস্করণ চালু রয়েছে। অ্যাপল কম্পিউটারে ভিন্ন প্রকৃতির মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহৃত হওয়ায় তার জন্য ভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকে এর নাম ছিল 'অ্যাপল ডস'। ৭ম সংস্করণের পর থেকে অ্যাপল পিসিতে আইবিএম পিসি'র ফাইল পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট আসলে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। একটি কম্পিউটারের সঙ্গে অন্য কম্পিউটারের সংযোগ সাধন করা সম্ভব হয় বলেই এ নেটওয়ার্কে অস্তিত্ব আছে। টেলিয়োগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি কম্পিউটারকে অন্যটির সাথে যুক্ত করা হয়। ওই যোগাযোগ সম্ভব হয় সাধারণ কিছু নিয়ম বা রীতি প্রতিপাদনের ফলে। ওই সাধারণ নিয়ম বা রীতির নাম প্রটোকল। এই প্রটোকলগুলো সফটওয়ার নির্ভর। তবে তার সঙ্গে হার্ডওয়ারের সংযোগ আছে। টিসিপি/আইপি এরকম একটি প্রটোকলের নাম। এই শব্দ দুটির প্রথমটিতে যোগাযোগ এবং দ্বিতীয়টিতে ইন্টারনেট পরিচালনার সূত্র নিহিত। টিসিপি মানে 'ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল' এবং আইপি মানে 'ইন্টারনেট প্রটোকল'।

অন্য অনেক উচ্চতর প্রযুক্তির মতো ইন্টারনেটের সূত্রপাতও সামরিক উদ্দেশ্য থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ তথা প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। যুদ্ধ সরঞ্জামে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এ প্রযুক্ত সহায়তা পেয়েছে অনেক। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের মাধ্যমে ইন্টারনেটের উদ্ভব হলেও তার উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় নি। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই প্রযুক্তির উন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারি খাত, সরকার এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অর্পণ করে। ওয়েব বা ইন্টারনেটের উপর কার্যত এখন কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। ওয়েব এর বিষয়াদি দেখাশুনা করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে একটি কনসোর্টিয়াম (কয়েকটি সংস্থার সম্মিলিত সংগঠন–

সংক্ষেপে ওয়েব থ্রি সি)। এ কনসোর্টিয়াম একটি অলাভজনক সংস্থা। ওয়েবের বিভিন্ন মান বা কীভাবে তা পরিচালিত হবে তা তারাই ঠিক করে।

ইন্টারনেট বলতে অনেক সময় আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বুঝিয়ে থাকি। টেক্সট, গ্রাপিকস, হাইপারটেক্সট ও মালিমিডিয়া এ সব কিছুর সমন্বয়ে এটি গঠিত। ওয়েব ব্রাউজার প্রোগ্রামের সাহায্যে ওয়েব পেজ খুঁজে বের করতে হয়। তবে ইন্টারনেট মানে শুধু ওয়েব নয়। ওয়েবের আর্বিভাবের পূর্বেই গোফার, এফটিপি'র মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। তবে আজকের দিনের ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার মূলে যে ওয়েব তা নিয়ে বোধ করি সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ওয়েব যে কি প্রভাব বিস্তার করছে বিশ্বের কম্পিউটার মনস্ক ব্যক্তিদের মাঝে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। প্রতিষ্ঠার ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই ওয়েব পেজের সংখ্যা ০ থেকে কোটি কোটিতে পরিণত হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জুন ১৯৯৯ নাগাদ সারা বিশ্বে ইন্টারনেই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১৭৯ মিলিয়ন বা ১৭ কোটি ৯০ লক্ষ। তার মধ্যে ১০২ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ২০ লক্ষ ছিল যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায়। ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপাচ্য ও অনুন্নত দেশগুলোতে ছিল মাত্র ৮ লক্ষ। এ থেকে অবশ্য বোঝা যায়, ইন্টারনেটের যে বিস্ফোরণের কথা আমরা বলছি, তা মূলত উন্নত বিশ্বের গুটি কতক দেশেই সীমাবদ্ধ। ওয়েব পেজ ডোমেইন নামে রেজিস্ট্রেশন বা তালিকাভূক্তির দায়িত্ব পালন করে নেটওয়ার্ক সলিউশন নামক যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান। ডট কম, ডট নেট ইত্যাদি নাম তারাই তালিকাভুক্ত করে। তাদের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া শীর্ষ দশটি দেশের তালিকায় আছে, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, স্পেন, ইটালি, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। দুটি উন্নয়নশীল দেশ এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ৭৩ শতাংশ ওয়েব পেজের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের। বাকি ২৭ শতাংশ আছে ওই দশটি সহ অন্যান্য সব দেশের আয়ত্তে।

ইন্টারনেট ভরে আছে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে। এগুলো আছে বিভিন্ন সাইটে পৃথক পৃথক ফাইলরূপে। ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী এগুলো ওয়েব পেজে লোড হয়। তাছাড়া, ওয়েব পেজে থাকে বিভিন্ন হাইপারলিংক। যখন যেখানেই তিনি থাকুক না কেন, একটা লিংকে ক্লিক করলেই ব্যবহারকারী চলে যান ভিন্ন একটি স্থানে, বা ভিন্ন একটি পাতায়। এভাবে তিনি বিভিন্ন ধরনের সাইটের সন্ধান লাভ করেন। এই কাজগুলো নির্বিঘ্নে সমাধা করা হয় এইচটিটিপি প্রটোকল ব্যবহার করে। ওয়েবের হাইপারটেক্সট ফাইল স্থানান্তরের রীতিটির নাম 'হাইপারটেক্সই ট্রান্সফার প্রোটোকল' বা এইচটিটিপি। হাইপারটেক্সট এমন এক ধরনের পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্টকে বিভিন্ন লিংক সহ বিন্যস্ত করা যায়।

ইন্টারনেট সংযোগ সাধারণের কী কাজে লাগে? কী করা যায় তাতে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সম্পদগুলোকে ব্যবহার করা যায়। ওয়েব সাইটে

গিয়ে করার কাছে অনেক কিছু। সকল শ্রেণীর সকল লোকের জন্যই ওয়েব পেজে কিছু না কিছু আছে। এক একটি কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথমেই তথ্য সংগ্রহ করার কথা মনে আসে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েব পেজ থেকে সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যারা বিনোদনের জন্য উৎসুক, তারা সংগীতও সংগ্রহ করতে পারেন। ওয়েবে পাওয়া যায় বহু সফটওয়্যার। সেগুলো সহজেই ডাউনলোড করা যায়। সাম্প্রতিক সংবাদ সংগ্রহের জন্যও ওয়েব আকর্ষণীয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে নতুন বন্ধুও যোগাড় করা যায়। আলাপ করা যায় তাদের সাথে। পাঠানো যায় জন্মদিনে বা অন্য কোনো বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা কার্ড। বিভিন্ন সফটওয়ার পরিচালনায় সমস্যা হলে তার সমাধানও পাওয়া যায়। নামী দামি বহু পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন থেকে নির্বাচিত নিবন্ধ কপি করে নেওয়া যায়। চাকরি বাকরির প্রয়োজন থাকলে তার অনুসন্ধানও ওয়েব থেকে করা যায়। যারা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ইচ্ছুক, তারা ইন্টানেটের মাধ্যমেই আবেদনপত্র জমা দিতে পারে। যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ওয়েব পেজে পণ্যের বা ব্যবসার প্রচার করতে পারে। তার ফলে সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা বাড়তে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ব্যবহার করে আরো বহু কাজ করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আগামিতে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই কোনো না কোনোভাবে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগ রাখতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ই-বাণিজ্য এবং ই-ব্যবসার প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ব্যাপকহারে। মানুষ অনেক কিছু কেনা-কাটার জন্য ইন্টারনেটের ওপরই নির্ভর করছে। ইন্টারনেট আরো নানাভাবে প্রাত্যহিক জীবনকে বদলে দিচ্ছে। তার প্রতিক্রিয়া মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের ওপরে পড়তে পারে। এমন কি, বাসাবাড়ির খবরদারিও কম্পিউটারের উপর ছেড়ে দেওয়া যায়।

ইন্টারনেট সংযোগের জন্য মডেম লাগে। লাগে টেলিফোন সংযোগ। বিশ্বের বহু দেশে টেলিযোগাযোগ কাঠামো খুবই উন্নত। এতে ব্যবহৃত হচ্ছে স্যাটেলাইট বা ফাইবার অপটিক সংযোগ। বহু দেশ একে অপরের সাথে ফাইবার অপটিক সংযোগের সুবিধা নিতে পারে নি। এ জন্য বাংলাদেশকে প্রথমে এমন কোনো দেশের সাথে যুক্ত হতে হয়, সেখানে তেমন সংযোগ আছে। এ কারণে ভিস্যাট ব্যবহার করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদের ইন্টারনেট সুবিধা নিতে হয়। এ সেবা দেয় আইএসপি বা 'ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার' প্রতিষ্ঠানগুলো।

ই-মেইল। E Mail

১৯৬০'র দশকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক (আরপানেট) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার ব্যবহার করে পত্র যোগাযোগের জন্য রেমন্ড ইমলিসন একটি প্রোগ্রাম

লেখেন। তার ফলে ইমেলের সূত্রপাত হয়। ইমেল নেটওয়ার্ক সংযোগের একটি প্রোগ্রাম। বিভিন্ন কম্পিউটারে টেক্সট ডাটা আদান-প্রদানের জন্য একটি কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড বা মানমাত্রা অনুসরণ করে এটি তৈরি করা হয়েছে। ই-মেল তৈরি করা হয় প্রথাগত চিঠির মতো করে। যেমন : ১. প্রথমে কোনো চিঠি লিখতে হয়। ২. তারপর ইলেক্ট্রনিক খামে সেটিকে রাখতে হয়। ৩. তারপর সেটিকে পাঠানো হয় ইলেক্ট্রনিক পোস্ট অফিসে। আসলে এই পোস্ট অফিসটি একটি মেল সার্ভার বা শক্তিশালী কম্পিউটার। এর কাজ হচ্ছে মেইলটিকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় প্রেরণ করা। তা করতে গিয়ে ঠিকানাটি ডিকোড করতে হয়, দেখতে হয় সেটি কোথায় যাচ্ছে। এভাবে প্রাপকের মেইল সার্ভারে মেইলটি প্রেরণের দিকটি নিশ্চিত করা হয়। ৪. তারপর প্রাপকের সার্ভার সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যদি কোনো কারণে সেটি পাঠানো না যায় (ভুল ঠিকানা, প্রাপকের মেইল সার্ভারের অস্তিত্ব না থাকা ইত্যাদি কারণে), তাহলে প্রেরককে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মেইলটি পাঠানো সম্ভব হয় নি।

ইমেল ঠিকানাকে চিহ্ন দিয়ে দু ভাগ করা হয়। এর প্রথম অংশে থাকা ব্যবহারকারীর পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে থাকে কম্পিউটারের নাম (আসলে এটিও একটি সংখ্যা, সংখ্যাটিকে ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে)। ইমেল পাঠানোর জন্য পৃথক সফটওয়ারও আছে। একটি ইমেল একই সাথে অনেকের কাছেও পাঠানো যায়। ইমেল দ্রুত ও অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে যোগাযোগের সুবিধা দেয়। ইমেল যতই সুবিধার হোক না কেন, তা অনেক সময় যন্ত্রণারও কারণ হতে পারে। অন্যের ইমেল ঠিকানা জানার বিভিন্ন উপায় ইন্টারনেটে আছে। এভাবে ব্যবসার বিজ্ঞাপন বা নিছক ঝামেলা সৃষ্টির জন্য কেউ কেউ অন্যদের রাশি রাশি ইমেল পাঠাতে পারে। এভাবে অবাঞ্ছিত ইমেল এসে ব্যবহারকারীর মেলবক্স ভরে ফেলতে পারে। এগুলোকে ভরে স্প্যাম। এগুলো ফিল্টার করে বাদ দেওয়ার সুবিধা কোনো কোনো ইমেল সফটওয়্যারে থাকে। 'স্প্যাম' শুধু কোনো ব্যবহারকারীর জন্য নয়, আইএসপির জন্যও ঝামেলা সৃষ্টি করে থাকে।

ওয়েব পেজ। Web Page

'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব' শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেছিলেন টিম বার্নাস লি নামের এক বিজ্ঞানী। তিনি কাজ করতেন ইউরোপীয় পার্টিকল রিসার্চ সেন্টারে। ওয়েব ডকুমেন্টের ভিত্তি হচ্ছে এইচটিএমএল ভাষায় তৈরি ডকুমেন্ট। প্রতিটি ওয়েব পেজের নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে। যার নাম ইউআরএল। ব্রাউজার এই ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এ আছে লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইট। এক একটি ওয়েব সাইটে একটি বা বহু ওযেব পেজ থাকে। ওয়েব পেজকে 'হোম পেজ'ও বলে। ওয়েব পেজের আড়ালে আছে : ১. টেক্সই ফাইল বা তার কোড।

২. গ্রাফিক ফাইলের কোড। ৩. লিংক যার মাধ্যমে এক পাতা থেকে অন্য পাতায় কিংবা অন্য সাইটে যাওয়া যায়।

ব্রাউজার এগুলো থেকেই জেনে নেয় কিভাবে পৃষ্ঠাটি সাজাতে হবে, কী কী দেখাতে হবে। ইন্টারনেট সার্ভার থেকে টেক্সট ফাইলটি প্রথমে পাঠানো হয়। তারপর গ্রাফিকস ফাইলটি পাঠানো হতে থাকে। ইন্টারেনেটের মাধ্যমে অডিও বা ভিডিও ফাইল অনেকেই দেখতে চান। চলচ্চিত্র বা সংগীত থাকলে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। পুরো ফাইল পাঠাতে অনেক সময় লেগে যায়। স্বভাবতই একজন সার্ভারের ধৈর্য হারিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ইন্টারেনেটে ব্যয়িত সময়ের মূল্যও কম নয়। তাই স্ট্রিমিং অডিও ভিডিও ব্যবহার করে এ সীমাবদ্ধতাকে কাটানো হয়। শকওয়েভ (ম্যাক্রোমিডিয়ার তৈরি সফটওয়ার) বা রিয়েল অডিওর সাহায্যে এসব ফাইল ডাউনলোড করা যায়। তার ফলে ফাইল সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। ডাউনলোড শুরু হওয়া সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো চলতে শুরু করে।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীতে ওয়েব পেজের সংখ্যা ছিল ৩২০ মিলিয়ন বা ৩২ কোটি। ২০০৮ এর শেষে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩০০ মিলিয়ন বা ১৩০ কোটি। একে রীতিমত বিস্ফোরণ বললেও কম বলা হয়। এ বিস্ফোরণের একটি অসুবিধার দিকও আছে। ওয়েব পেজের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠা বা পরিচিতি দরকার হয় না। যে কেউ ইচ্ছা করলে ওয়েব পেজ চালু করতে পারে। আবার আইএসপির কাছেও নিখরচায় অনেক সময় ওয়েব স্পেস পাওয়া যায়। এর ফলে ওয়েবে গুরুত্বহীন জিনিস আছে অনেক। গুণগত দিক থেকে খুবই নিম্নমানের জিনিসও আছে। এজন্যে গবেষকরা অনেক সময় এফটিপি বা গোফারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। যা হোক, এত বেশি সাইট থাকার মানে হচ্ছে ব্যবহারকারীর আছে অনেক অপশন। অনেকের কাছে ইন্টারনেটে একটি প্রিয় কাজ হচ্ছে সার্ফিং করা। তার মানে হচ্ছে এক সাইট থেকে আরেক সাইটে যাওয়া।

কম্পিউটার গেম

নোলান কে বুশনেলের নাম কম্পিউটার গেমে উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত। ১৯৭১-৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'নাটিং এসোসিয়েটস' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সেখানে কাজ করার সময় তিনি 'কম্পিউটার স্পেস' নামে একটি গেম উদ্ভাবন করেন। এর ব্যবসায়িক সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'সিজগি' নামে একটি কোম্পানি। পরে সেটির নাম হয় 'আটারি'। চীনে একটি খেলা আছে, যেটির নাম গো। এই খেলার সময় আটারি উচ্চারণ করে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। সেই গেম থেকে এই নামটি নেওয়া হয়েছে। এরপর ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তার হোম সংস্করণ বের করা হয়। আটারির পদাংক অনুসরণ করে আরো বহু প্রতিষ্ঠান গেমের জগতে এসেছে। তার

মধ্যে এমিগা, নিনটেন্ডো, কিংবা সাম্প্রতিককালের সনির নাম উল্লেখযোগ্য। এর ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বেশি বলেই মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানি গেমের দিকেও মনোনিবেশ করেছে। উইন্ডোজ সফটওয়ার দ্রুত বড় কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। গেম খেলার জন্য এক সময় পৃথক কম্পিউটার লাগতো। পিসিতে ছোটখাট গেমই খেলা যেতো। গেমের চাহিদা ছিল গতির, গ্রাফিক্সের। গেমের প্রস্তুতকারকরা সে সময় পিসিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি। পিসির ক্ষমতা সত্যিকার অর্থেই বেড়ে যাওয়ার পর এখন পিসি ভিত্তিক গেমের অভাব নেই।

প্রতিটি গেমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্য নির্ভর করে গেমের প্রকৃতির উপর। কোনো কোনো গেম প্রতিবারে নতুন অবস্থায় খেলা হয়। আবার কিছু কিছু গেম প্রতিটি অবস্থায় বৈচিত্র্যময়। বেশির ভাগ গেমে থাকে একাধিক লেভেল। এক লেভেল অতিক্রম করেই অন্য লেভেলে যাওয়া যায়। র্থাৎ ক্রমান্বয়ে সহজ লেভেল থেকে জটিল লেভেলে যেতে হয়। তবে প্রতিবার খেলার সময় প্রথম লেভেল থেকে শুরু করতে হবে এমন কথা। মাঝখানে কোনো লেভেলে গিয়ে খেলা শেষ করতে চাইতে চাইলে সেভ করা যায়। তখন সেই লেভেলে এসে পুনরায় খেলা শুরু করা যায়। অনেক গেম আবার ব্যবহারকারীকে তার দক্ষতার ভিত্তিতে খেলার সুযোগ দেয়। যেমন : ফিফা গেমটিতে এমেচার, প্রফেশনাল, ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইত্যাদি আছে। এতে সহজ থেকে কঠিন গেম খেলা যায়। দক্ষতা বাড়লে গেমার ধীরে ধীরে উচ্চ স্তরে যেতে পারেন। আসলে দুর্বল গেমারের কথাও ভাবা হয়েছে। অনেক একশন গেমে গেমার যে চরিত্র নিয়ে খেলেন, সেটার একাধিক লাইফ থাকে। ফলে দুয়েক বার মারা গেলেও বা পরাজিত হলেও খেলা চালিয়ে যাওয়া যায়। অস্ত্রেরও বৈচিত্র্য আছে। একেক লেভেলে এক এক ধরনের অস্ত্র পাওয়া যায়।

এ সমস্ত গেমকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় সেগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন : বল গেম, একশন গেম, স্ট্র্যাটেজি গেম ইত্যাদি। বল গেমের কথাই ধরা যাক। পিসিতে প্যারানয়েড অন্তত একবার খেলেন নি এরকম লোক কমই আছে। বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত বল গেমের অনুকরণ ছাড়াও বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজির উপর নির্ভর করে গেম বানানো হয়েছে। ডি এক্স বল, পিন বল এ ধরনের গেম। কিছু আছে একশন গেম। কয়েকটি একশন গেম হচ্ছে কোয়েক, টুম্ব রেইডার, ডিউক নিউকেম, এনএফএস ইত্যাদি। পাজল গেম আরেক ধরনের গেম। এর মধ্যে ট্রিভিয়াল পারস্যুইট, বাকু বাকু ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন কার্ড গেমও এ ধরনের গেম। স্পেস কমব্যাট গেম আরেক ধরনের গেম। সায়েন্স ফিকশন বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর আবেদন এখনকার প্রজন্মের কাছে অপরিসীম। স্পেস শাটল ব্যবহার করে এবং লেজার জাতীয় অস্ত্র নিয়ে ভিন গ্রহের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে কে না চান!

স্টার ওয়ার্স নামে জনপ্রিয় সিনেমার উপর ভিত্তি করে একাধিক গেম নির্মিত হয়েছে। এটির নির্মাতা লুকাস আর্টস। এতে সিনেমার চরিত্রগুলোও আছে। এর ঘটনাগুলো ঘটে ভবিষ্যতে। যখন এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে যাতায়াত কোনো ব্যাপার নয়। যুদ্ধ হয় গ্রহ দখল করার জন্য। ভিলেন ক্ষমতা চায় ইউনিভার্সের প্রভু হতে। স্টার ওয়ার্স দি ফ্যান্টম মিনেস এরকম গেমের একটি। ওই গেমে আছে ১১টি লেভেল বা স্তর। প্রতিটি লেভেলে ভিন্ন ভিন্ন শত্রুর সাথে খেলতে হয়, বা যুদ্ধ করতে হয়। কোনো লেভেলে কাউকে উদ্ধার করা বা কোনো লেভেলে স্পেসশিপে ওঠা, কোনো লেভেলে কাউকে খুঁজে বের করাই উদ্দেশ্য। তাদের সাথে শুধু যুদ্ধ নয়, কথাও বলা যায়। এটিকে একশন গেমও বলা যায়। থ্রি ডি এফেক্ট থাকাতে গেমটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। গ্রাফিক্স অত্যন্ত উচ্চমানের। ফলে গেমটি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এইডোজ সফটওয়ারের তৈরি একটি অ্যাডভেঞ্চার গেমের নাম টুম্ব রেইডার। এর মূল চরিত্র বা নায়িকা লারা ক্রফট। সে এক কথায় অসাধারণ। লারা ক্রফটকে চেনে না এমন গেমার পৃথিবীতে বোধ হয় কমই আছে। জনপ্রিয়তায় এটি অত্যন্ত এগিয়ে এর মধ্যে। এর তিনটি সংস্করণ বেরিয়েছে। ভবিষ্যতে আরো বেরোবে। লারা ক্রফট বিভিন্ন স্থানে অভিযানে বেরোয়। এ অভিযানে সে যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তা নিয়েই এ গেম। অভিযানটি ঘটে একেক সময় একেক জায়গায়। অভিযানে সে ক্রমান্বয়ে ভয়ানক অবস্থার মধ্যে পড়তে থাকে। কোথাও আছে গ্যাঙস্টার বা মাস্তান বাহিনী। কোথাও ভয়ংকর উপজাতি। আবার কোথাও আছে ভয়ানক জানোয়ার। তাই বিভিন্ন স্তরে এসব প্রতিকূলতার মধ্যে জয়লাভের নেশায় গেমার ভিন্ন জগতে হারিয়ে যায়। গেম শেষ হয় কোনো একটি বস্তুকে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে।

গাড়ি ছোট বড় সকলকেই আকর্ষণ করে। এটা গতির স্মারক। 'নিড ফর স্পিড' একটি রেসিং গেম। এটি ইলেক্ট্রনিক আর্টসের তৈরি। এতে যে গ্যারাজ আছে, তাতে আছে পৃথিবীর নামী দামি এবং বিলাসবহুল সব গাড়ির মডেল। বিএমডব্লিউ হোক বা হোক ফেরারি– গেমার স্বচ্ছন্দে এর যে কোনো একটি বেছে নিতে পারেন। তবে প্রথমেই নয়। এজন্যে অপেক্ষা করতে হয়। গেমের শুরুতে তাকে দেওয়া হয় সামান্য কিছু অর্থ। সে অর্থ দিয়ে খুব ভালো গাড়ি কোনো যায় না। যাই হোক, বেছে নেয়ার পর শুরু হয় সেগুলো নিয়ে দৌড়। দৌড়ের জিততে পারলে গেমার পান বিশাল সব প্রাইজ মানি। সে টাকা দিয়ে আরো ভালো গাড়ি কেনা যায়। ওই গেমে আছে হট পারস্যুট। হলিউডে এই থিমের উপর ভিত্তি করে অনেক বিখ্যাত সিনেমা তৈরি হয়েছে, নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে। হট পার স্যুটের সময় পুলিশ গেমারকে ধাওয়া করে। পুলিশকে ধাপ্পা দেওয়া সহজ কথা নয়। কারণ, পুলিশ প্রয়োজনবোধে হেলিকপ্টার ব্যাক আপ নিতে পারে। এমনিতর নানা কঠিন অবস্থাতে জিতে আসার মধ্যেই গেমের পরম আনন্দ অনুভব করা যায়।

প্রিন্স নামে একটি গেম বহুদিন ধরে পিসিতে গেমারদের আনন্দ দিয়েছে। এর নায়ক পারস্যের এক রাজকুমার। তার ভিলেন হচ্ছে জাফর। ভিলেন রাজকুমারীকে অপহরণ করলে রাজকুমার তাকে উদ্ধার করতে ব্রতী হয়। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে নানা বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। তার উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে এ সব প্রতিকূলতাকে জয় করতে হবে।

'ডেথট্রাপ ডানজন এইডোজ' সফটওয়ারের আর একটি এডভেঞ্চার গেম। এর গল্প হচ্ছে এক রাজাকে নিয়ে। রাজা তার উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন যোগ্য উত্তরসূরী কাছে। যোগ্য উত্তরসূরীকে এজন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তিনি পরীক্ষার জন্য তৈরি করেন একটি দুর্গ। এতে বহু ধরনের ভয়ংকর অবস্থা তৈরি করা যায়। যে এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতে দুটি চরিত্র আছে। একটি নারী ও অপরটি পুরুষ। গেমার এর যে কোনোটি নিয়ে খেলতে পারেন। বিভিন্ন লেভেলে গেমার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অস্ত্র পান। এমন কি গেমার যাদু করার অস্ত্রও পান। বিভিন্ন স্তরে এগুলো পাওয়া যায় এবং পরে সেগুলো ব্যবহার করা যায়।

একটি স্ট্র্যাটেজী গেম হচ্ছে 'এজ অব এমপায়ার'। এটি মাইক্রোসফটের তৈরি। খেলার পটভূমি সভ্যতার শুরুতে। একটি জাতির প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস রচনাই তার উদ্দেশ্য। গেমারকে একেক বার একেক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তার শত্রু হচ্ছে অন্য জাতি। তারাও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে জয় লাভের জন্য। গেমারকে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য জাতির চাইতে বড় হওয়া।

কম্পিউটার গেম কি ভালো! না মন্দ! এ প্রশ্ন অনেক অভিভাবককে পীড়িত করে। সমাজতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদগণ এ নিয়ে গবেষণাও করছেন। এক সময় দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে বাচ্চাদের ঘরে ধরে রাখার জন্য বাবা-মারা তাদের ভিডিও গেম কিনে দিচ্ছেন। তাদের ভয়, বাইরের জগতে বেশি ক্ষণ থাকলে তারা খারাপ সংসর্গে পড়ে যাবে। আবার দিনে সে সব তরুণ-কিশোররা ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও গেম নিয়ে মেতে থাকে, তাদের পড়াশোনার মনোসংযোগ নষ্ট হয়। অনেকে পড়াশোনার চাইতে গেমের পেছনেই সময় নষ্ট করে বেশি। আবার কোনো কোনো গেম তাদের মানসিক বিকাশকেও ব্যাহত করে। বিশেষ করে ভয়ানক বা মারমুখী গেমগুলো তাদের আচরণকেও পরিবর্তিত করতে পারে। গেম খেললে কম্পিউটারে দক্ষতা বাড়বে এ কথাও অনেকে বলেন। যদি অন্যান্য প্রোগ্রাম আয়ত্ত না করে, শুধু গেমের পেছনে সময় বেশি ব্যয় করা হয়, তাহলে গেম খেলে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বোধ করি আদৌ নেই, এ কথাটিও সত্য বটে।

কম্পিউটার ভাইরাস

ভালো-মন্দ আমাদের জীবনের অঙ্গ। তেমনি কম্পিউটার সফটওয়্যারের ভালো দিকের বিপরীতে আছে ভাইরাস। ভাইরাস পরজীবী। প্রাণীদেহে প্রবেশ করার পর বংশবৃদ্ধি করে এবং ক্ষতি করে। কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের শক্তিশালী সফটওয়ার। কখনো তা প্রোগ্রাম ফাইলকে আক্রমণ করে। কখনো করে সাধারণ ডকুমেন্ট ফাইলকে। কখনো কখনো কম্পিউটারটিকে অচল করে দিতে পারে। আবার কখনো যা করে তা রসিকতার পর্যায়ে পড়ে বা বড় জোর বিরক্তিকর। সন্দেহ নেই, ভাইরাস যে কোনো কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্যে আতংকের সৃষ্টি করে থাকে।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে জন জন ভন নিউম্যান বলেছিলেন কম্পিউটারের প্রোগ্রামের পক্ষে বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে পঞ্চাশের দশকে বেল ল্যাবরেটরিতে কর্মরত প্রোগ্রামাররা 'কোর' নামে একটি গেম তৈরি করেছিলেন। এই প্রোগ্রাম অন্যের কম্পিউটারে গিয়ে আক্রমণ করতে পারত। আক্রমণ করে ডাটা নষ্ট করতো। ফ্রেড কোহেন নামে বিদ্যুৎ প্রকৌশলের এক ছাত্র 'ভাইরাস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ট্রোজান হর্স বের হয়। তার কয়েক বছরের মাথায় ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এখন তা ভাইরাস তো প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে। আগে ভাইরাস ফ্লপি বা বহনযোগ্য মাধ্যমে ছড়াতো। এখন ইন্টারনেটের ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

গঠন বা আক্রমণের প্রকৃতি অনুসারে ভাইরাসের কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : 'বুট ভাইরাস', 'প্রোগ্রাম ভাইরাস', 'পলিমর্ফিক ভাইরাস', 'ম্যাক্রো ভাইরাস' প্রভৃতি ধরণের ভাইরাস।

কম্পিউটার বিষয়ক শব্দকোষ

ওয়ান এম, টু এম... I IM, 2M...

ইংরেজি M শব্দটি দিয়ে এখানে মেগাবাইট বোঝানো হয়েছে। সুতরাং ১এম, ২এম. ইত্যাদি মানে ১-২-৩-৪ ইত্যাদি মেগাবাইট। কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি বা হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, অপটিক্যাল ডিস্ক ইত্যাদির ধারণ ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়।

২৮৬.৩৮৬এসএক্স I 286, 386SX..

486SX, 486DX, 8086. 8088, 68000, 68020, 68030, 68040 ইত্যাদি এই সংখ্যাগুলো মাইক্রোপ্রসেসরের পরিচয় বহন করে। প্রতিটি সংখ্যা দিয়েই ভিন্ন ভিন্ন

ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর বোঝানো হয়ে থাকে। ৮৬ সংখ্যা দিয়ে শেষ করা প্রসেসরগুলো ইনটেল তৈরি করে আর ৬৮ সংখ্যা দিয়ে শুরু করা প্রসেসরগুলো মটরোলা তৈরি করে।

৩৮৬ এনহেন্স মোড I 386 Enhanced Mode

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ একটি ডস নির্ভর অপারেটিং সিস্টেমের নাম। এটি উইন্ডোজ স্ট্যান্ডার্ড বা এনহেন্সড মোডে চালানো যায়। আই.বি.এম. পি.সি./কম্পাটিবল কম্পিউটারে ৩৮৬ বা তার পরবর্তী প্রসেসর থাকলে এই মোডে উইন্ডোজ চালানো যায়। এই মোডে ইউন্ডোজ চালানোর সময় কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের স্মৃতিকেও র‍্যাম (অস্থায়ী স্মৃতি শক্তি) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। র‍্যাম ব্যবহৃত হয় সফটওয়্যার চালানোর জন্যে। এনহেন্সড মোড ব্যবহার করার ফলে উইন্ডোজ পরিবেশে একসঙ্গে একাধিক সফটওয়্যার চালানো যেতে পারে। যদি এনহেন্সড মোড ব্যবহার না করা হয় তাহলে একসঙ্গে কেবল একটি সফটওয়্যার চালানো যায়। এনহেন্সড মোডে যেহেতু হার্ড ডিস্কের স্মৃতিতে কাজে লাগানো যায় তাই সফটওয়্যার অতিরিক্ত র‍্যাম পেতে পারে। মেকিনটোশ কম্পিউটারের সিস্টেম ৭.০-তেও এই সুযোগ রয়েছে। একে মেকিনটোশের ভাষায় 'ভারচুয়াল মেমোরি' বলে।

৩.৫ ইঞ্চি ডিস্ক I 3.5" Disk

আজকের দিনের পার্সোনাল বা মাইক্রো কম্পিউটারে সচরাচর ৩.৫" আকারের ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগেও এই আকারের ডিস্ক কেবল মেকিনটোশ কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো।

৮ বিট কম্পিউটার I 8 Bit Computer

কম্পিউটারের হিসেবে ৮ বিটে একটি বাইট হয়। আবার ১টি অক্ষরও সচরাচর ৮ বিটের হয়। যেসব কম্পিউটারের সি.পি.ইউ. বা মাইক্রোপ্রসেসর একবারে ১টি অক্ষর বা ৮টি বিট গ্রহণ করতে পারে তাকে ৮ বিটের কম্পিউটার বলে।

১৬ বিট কম্পিউটার I 16 Bit Computer

যেসব কম্পিউটারের সি.পি.ইউ. ২টি অক্ষর বা ১৬ বিট গ্রহণ করতে পারে তাকে 16 Bit Computer কম্পিউটার বলে। একে 'ডবল বাইট কম্পিউটার'ও বলা হয়।

৩২ বিটের কম্পিউটার I 32 Bit Compute

যেসব কম্পিউটার ৩২টি বিট বা ৪টি অক্ষর একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে তাকে ৩২ বিট কম্পিউটার বলে। সাম্প্রতিককালে মেকিনটোশ এবং Windows ভিত্তিক পিসিতে ৩২ বিটের কম্পিউটিং প্রচলিত হয়েছে।

এক্সেস I Access

'এক্সেস' শব্দের অর্থ প্রবেশ। কম্পিউটারে সাধারণত 'এক্সেস' বলতে ডিস্কের তথ্য অনুসন্ধানকে বোঝানো হয়। কোনো তথ্য ডেটাবেজ, নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে আসা-যাওয়াকে 'এক্সেস' নামে বোঝানো হয়। 'এক্সেস' নামে মাইক্রোসফটের একটি ডিবেজ প্রোগ্রামও রয়েছে।

এক্সেস টাইম I Access Time

ব্যবহারকারী এমন অনেক নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যে নির্দেশের ভিত্তিতে অপারেটিং সিস্টেমকে ফ্লপি অথবা হার্ট ডিস্ক থেকে তথ্য আহরণ করে নিয়ে আসতে হয়। অপারেটিং সিস্টেম তথ্য আহরণের জন্যে ডিস্কে নির্দেশ পাঠানোর সময় থেকে ডিস্ক থেকে তথ্য আহরণ করে নিয়ে আসার মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় 'এক্সেস টাইম' (Access Time)। হার্ড ডিস্কের এক্সেস টাইম (Access Time) ৫ মাইক্রোসেকেন্ড (দ্রুত) থেকে ১০০ মাইক্রেসেকেন্ডের (মন্থর) মধ্যে হয়ে থাকে। এক্সেস টাইমের ব্যবধান ব্যবহারকারীদের চোখে সাধারণত ধরা পড়ে না। কিন্তু ডাটাবেজ বা এ রকম কিছু প্রোগ্রাম ব্যবহার করার সময় এক্সেস টাইমের ব্যবধান বোঝা যায়। বড় বড় ফাইল নিয়ে কাজ করার সময়ও এই পার্থক্য বোঝা যায়।

একাউন্টিং প্যাকেজ I Accounting Package

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ করার জন্যে পার্সোনাল কম্পিউটারে এক ধরনের পূর্বপ্রস্তুতকৃত প্যাকেজ প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। এগুলোকে 'একাউন্টিং প্যাকেজ' বলা হয়। এসব প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে মালামালের হিসাব নিকাশ,

Complete Modern Computer - পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কম্পিউটার

ইনভয়েসিং, টাকা পরিশোধ, গ্রহণ, মালামালের বিক্রয় আদেশ প্রসেস করা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির হিসাব, সম্পত্তির হিসাব, জব কস্টিং ইত্যাদি কাজ করা যায়। একাউন্ট্যান্ট ইনক, M.Y.O.B ডেকইজি ইত্যাদি নামে একাউন্টিং প্যাকেজ রয়েছে।

অ্যাকটিভ ইউন্ডো। Active Window

অনেকগুলো ইউন্ডোর মাঝে সক্রিয় ইউন্ডোটি হচ্ছে সক্রিয় পর্দা বা Active Window। মেকিনটোশ বা ইউন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে একাধিক উইন্ডো খোলা যায়। তবে একবারে একটির বেশি উইন্ডোকে সক্রিয় করা যায় না।

অ্যাকটিভিটি লাইট। Activity Light

অনেক কম্পিউটার, মোডেম বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রে ছোট ছোট বাতির সাহায্যে কোনো যন্ত্র, ডিস্ক ড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক কর্ম সম্পাদনে সক্রিয় হচ্ছে কি না তা বোঝা যায়। এসব বাতি সক্রিয় না থাকা এসব যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা নির্দেশ করে।

এক্সিলেরেটর বোর্ড। Accelerator Board

সাধারণত কম্পিউটার তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ সাধারণ গতিতেই চলে। অনেক সময় বিভিন্ন এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা বিশেষ কোনো কাজ সাধারণ গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে করার প্রয়োজন হয়। এক্সিলেরেটর বোর্ড সেই গতি বৃদ্ধির কাজ করে। এ ধরনের বোর্ড কম্পিউটারের এক্সপানশন স্লটে স্থাপন করা হয়ে থাকে।

অ্যাবোর্ট। Abort

আই.বি.এম. পি.সি-তে এই কমান্ড কোনো চলমান কাজকে বন্ধ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। DOS কমান্ডে Esc বোতাম চেপে এবোর্ট কমান্ডের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

অ্যাবসোলিউট সেল রেফারেন্স। Absolute Cell Reference

কোনো স্প্রেডসিট প্রোগ্রামে বিশেষ একটি ফর্মূলাকে যে নির্দিষ্ট সেলের জন্যে প্রযোজ্য করা হয় তাকে 'অ্যাবসোলিউট সেল' বলে। যখন এই ফর্মূলা অন্য কোনো সেলের জন্যে প্রযোজ্য করা হয় তখন তাকে 'অ্যাবসোলিউট সেল রেফারেন্স' বলা হয়ে থাকে।

আডা। ADA

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের তৈরি একটি উচ্চ পর্যায়ের (High Level) প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা (Programming Language)। সব রকমের সামরিক প্রোগ্রাম

অ্যাপ্লিকেশনের জন্যে এ্যাডা (ADA) একটি অপরিহার্য প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা। বিখ্যাত ইংরেজ কবি বায়রনের কন্যা এবং 'কম্পিউটারের জনক' হিসেবে খ্যাত চার্লস ব্যাবেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেডি অগাস্টা অ্যাডা বায়রনের নাম অনুসারে এ নামাকরণ করা হয়েছে। অ্যাডাকে পৃথিবীর প্রথম 'মহিলা কম্পিউটার বিজ্ঞানী' বা প্রোগ্রামার হিসেবে ধরা হয়। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত সিস্টেম উন্নয়নের জন্যে ৪ শতেরও বেশি প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা (Programming Language) তৈরির লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮০ খ্রি. কমিটি তাদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা অ্যাডা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলে থাকেন যে, একটি মাত্র প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা দিয়ে সকল কাজ করা যায় না। অ্যাডা একটি বিশাল প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা। এ ভাষার কম্পাইলারের জন্যে লক্ষাধিক কোড লাইন ব্যবহার করতে হয়। এজন্যে সমালোচকরা একে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বলে উল্লেখ করে থাকেন। তবুও অ্যাডা এখনো বেশ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যাডা এখন পার্সোনাল কম্পিউটারেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পার্সোনাল কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্যে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের অনুমোদিত কম্পাইলার বেছে নিতে হবে।

অ্যাডাপটর। Adapter

অ্যাডাপটর হচ্ছে কম্পিউটারের সম্প্রসারণ বাস (Expansion Bus)-এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি সার্কিট বোর্ড। কম্পিউটারের অতিরিক্ত বা বর্ধিত কাজের জন্যে অ্যাডাপটর ব্যবহৃত হয়। পার্সোনাল কম্পিউটারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যাডাপটর হচ্ছে প্রদর্শন অ্যাডাপটর (Display Adapter), স্মৃতি সম্প্রসারণ অ্যাডাপটর (Memory Expansion Adapter), ইনপুট-আউটপুট অ্যাডাপটর।

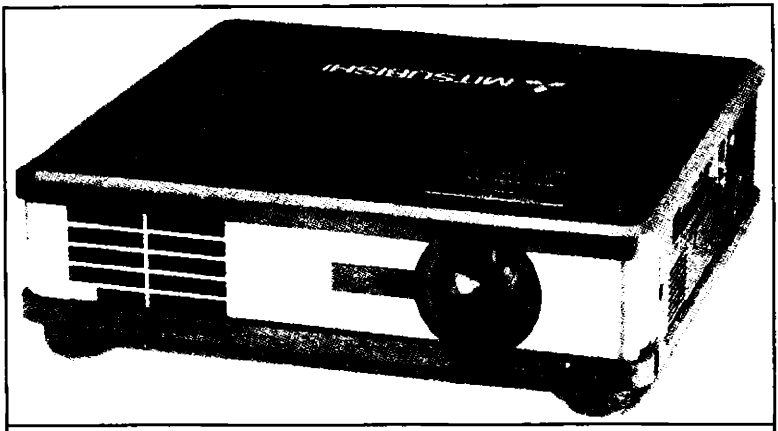

Projector - প্রজেক্টর

এসব অ্যাডাপটরের বেশিরভাগই এখন কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে সংযোজন করে দেওয়া হয় বা বিল্ট-ইন থাকে।

এ.ডি.বি. I ADB

Apple Desktop Bus-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে A.D.B., A.D.B. হচ্ছে সিরিয়াল বাস পোর্ট। মেকিনটোশ কম্পিউটারের পেছনে এ বাসের সংযোগ জ্যাক (Jack) থাকে। এ জ্যাকের সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে কী-বোর্ড, মাউস এবং অন্যান্য ডেস্কটপ বাস ডিভাইস, যেমন: গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, হ্যান্ড কন্ট্রোলার, বিশেষ কী-বোর্ড ইত্যাদি সংযুক্ত করা যায়।

অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর I Adobe Illustrator

অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে মেকিনটোশ এবং আই.বি.এম. পিসি'তে ব্যবহারযোগ্য পেশাদারি মানের অঙ্কন প্রোগ্রাম। ম্যাক পেইন্ট (Mac Paint) এবং ম্যাক ড্র (MacDraw)-এর মাধ্যমে মেকিনটোশে অলঙ্কারণের কাজের যাত্রা শুরু হয়। এখন আরো অনেক অগ্রসর এবং উন্নতমানের অলঙ্করণ বা ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম পাওয়া যায়।

এ.এন.এস.আই. I ANSI

American National Standard Institute বা A.N.S.I হচ্ছে স্বেচ্ছা ভিত্তিক মান (Voluntary Standards) উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমেরিকার শিল্প পণ্যের প্রাধান্য লাভ ও শিল্প পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পণ্যের মান নির্ধারণ করে থাকে। কম্পিউটার শিল্পের ক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। A.N.S.I. কমিটি কম্পিউটারের প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা (Programming Language) COBOL Fortran-এর প্রমিত সংস্করণ প্রণয়ন করেছে।

অ্যামি প্রো I Ami Pro

অ্যামি প্রো হচ্ছে মাইক্রোসফট ইউন্ডোজে ব্যবহারযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম। লোটাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এ প্রোগ্রামটি বাজারজাত করেছে।

অ্যানিমেশন I Animation

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে সচল ছবি বা কার্টুন ইত্যাদি তৈরি করার নাম 'অ্যানিমেশন'। এতে একটি ছবির একেকটি ভঙ্গিকে একটু একটু করে পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ভঙ্গি সম্পন্ন করা হয়। দ্রুত গতিতে প্রদর্শনের সময় ছবিটিকে সচল দেখা যায়।

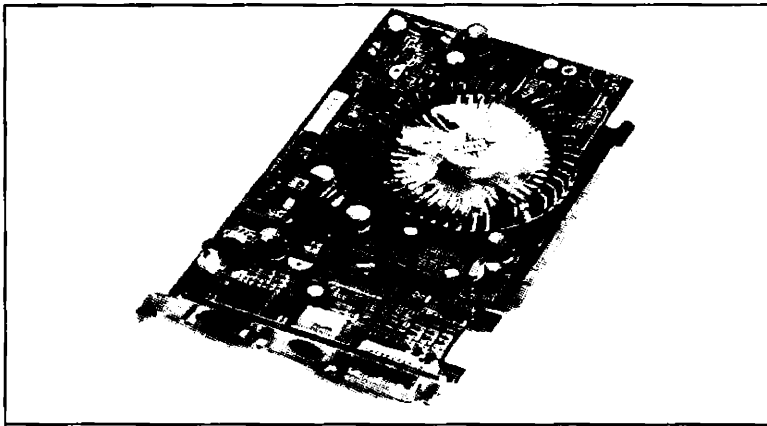

AGP Card - এজিপি কার্ড

এ.পি.ডি.এ. । APDA

Apple Programmers and Developers Association-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে A.P.D.A. এই APDA একটি বোর্ডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অ্যাপলের প্রোগ্রামার, ব্যবহারকারী ও সফটওয়্যার প্রস্তুতকারকদের জন্যে প্রোগ্রাম, রিসোর্স ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা ও তথ্য বিনিময়ের সুযোগ দিয়ে থাকে। অ্যাপলের চলতি সংস্করণের ডেভেলপমেন্ট টুল, ডিবাগার, কম্পাইলার, ল্যাংগুয়েজ এবং অন্যান্য কারিগরি তথ্য সম্পর্কে অ্যাপল-এর ব্যবহারকারীদের অবহিত রাখাই A.D.P.A.-এর মূল লক্ষ্য।

অ্যাপল টক । Apple Talk

অ্যাপলের মেকিনটোশ কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম (Network System) কে অ্যাপল টক (AppleTalk) বলা হয়। স্থানীয় (Local Area) ও দূরবর্তী (Wide Area) নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ওয়ার্ক স্টেশন এবং ডিভাইস অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে অ্যাপলটক নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। মেকিনটোশ কম্পিউটারে অ্যাপলটক নেটওয়ার্ক সুবিধে বিল্ট-ইন (Built-in) থাকে। মেকিনটোশের সিস্টেম সফটওয়ারের সঙ্গে অ্যাপলটক সফটওয়ার দেওয়া থাকে। AppleTalk নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করার মতো ডিবাইসগুলো হচ্ছে অন্যান্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফাইল সার্ভার ইত্যাদি। অ্যাপলটক নেটওয়ার্ক তৈরির জন্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা যায়। যেমন : লোকাল টক (Local Talk) ক্যাবল, ইথারনেট (Ether Net) নেটওয়ার্ক ক্যাবল ইত্যাদি।

অ্যাপল কম্পিউটার I Apple Computer

Apple Computer Inc. হচ্ছে পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরির একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের কুপারটিনোতে এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর অবস্থিত। স্টিভ ওজনিয়াক ছিলেন হোমব্রু কম্পিউটার ক্লাব (Homebrew Computer Club)-এর সদস্য এবং হিউলেট-প্যাকার্ড কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। তিনি জবস-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে Apple I (অ্যাপল-১) নামে একটি কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করেন। এরপর তারা তৈরি করেন Appll II (অ্যাপল-২) কম্পিউটার। এ কম্পিউটার জনসাধারণের হাতে পৌঁছে। Apple-I এবং Apple-II কম্পিউটারে M.O.S.T. 6502 (Multipte Operating System Technology 6502) মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হয়। MOST 6502 ছিল ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর। এ মাইক্রোপ্রসেসর ইনটেল ৮০৮০ (Intel 8080) মাইক্রোপ্রসেসরের তুলনায় ছিল সস্তা। শব্দ এবং রঙিন গ্রাফিক্সের সুযোগ থাকায় Apple-II প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্যে খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কিছু তৃতীয় প্রতিষ্ঠান Apple-II এর জন্যে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় সফটওয়ার তৈরি করে। ভিসি ক্যাল্ক (Visi Calc) এ রকম একটি প্রথম ইলেকট্রনিক্স স্প্রেডসিট প্রোগ্রাম। এ সফটয়ারের সুযোগপ্রাপ্ত হাজার হাজার Apple-II কম্পিউটার ছোট ও বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে স্থান করে নেয়।

আর্কিটেকচার I Architecture

কম্পিউটারের প্রতিটি যন্ত্রাংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সংযোগ স্থাপনের জন্যে প্রণীত নকশাকে সামগ্রিকভাবে 'আর্কিটেকচার' (Architecture) বলা হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবস্থাপনার শক্তি বর্ণনার জন্যে আর্কিটেকচার প্রসঙ্গটি বেশি উল্লেখিত হয়। যেমন : ইনটেলের ৮০৮৮ মাইক্রো প্রসেসরের ৮-বিট আর্কিটেকচার বলতে ৮ বিট ডেটা বাস (Data Bus) নির্দেশ করা হয়, যে ডাটা বাস একবারে মাত্র ১ বাইট ডাটা আদান-প্রদান করে থাকে।

অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ I Assembly Language

Assembly Language হচ্ছে সাধারণ স্তরের (Low-Level) প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা (Programming Language)। এ প্রোগ্রামে প্রতিটি নির্দেশের (Instruction) জন্যে স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম স্টেটমেন্ট থাকে। অ্যাসেম্বলি হচ্ছে একটি পদ্ধতিগত (Procedural) ভাষা। এতে সংক্ষেপে এবং সুনির্দিষ্টভাবে কম্পিউটারের করণীয় নিদের্শ প্রদান করা হয়।

অ্যাসেম্বলার I Assembler

অ্যাসেম্বলার হচ্ছে প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাংগুয়েজে বা মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রোগ্রাম।

অডিও ডিভাইস I Audio Device

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেকর্ড করা বা ধারণ করা শব্দ যে সব যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়, সে সব যন্ত্রকেই 'অডিও ডিভাইস' বলা হয়। Audio শব্দের অর্থ শ্রবণ এবং Devices শব্দের অর্থ যন্ত্রাদি।

অটোলিম্প I Autolimp

অটোলিম্প হচ্ছে ক্যাড (CAD) বা অটো ক্যাড (Auto Cad) প্রোগ্রাম তৈরির ভাষা (Language)।

অটোমেশন I Automation

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহারের সাহায্যে মানুষের হাতে-কলমে কাজ করার দক্ষতা ও স্থানগুলো দখল করে নেওয়াই হচ্ছে অটোমেশন। অফিস অটোমেশনেরর ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে একটি অন্যতম প্রধান প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এ I ইউএক্স I A I UX

এ/ইউএক্স (A/UX) হচ্ছে UNIX (ইউনিক্স) অপারেটিং সিস্টেমের অ্যাপল কম্পিউটারের সংস্করণ। ৬৮০২০/৬৮০৩০ মাইক্রোপ্রসেসর বিশিষ্ট ৪ মে.বা. র‍্যামের মেকিনটোশ কম্পিউটারে এ/ইউএক্স (A/UX) অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যায়।

ই.ইউ.এক্স) I AUX

ডস (DOS) অপারেটিং সিস্টেমের আই.বি.এম. পি.সি'র সহায়ক পোর্ট (Auxiliary Port)-এর এ.ইউ.এক্স. (AUX) বলা হয়। যোগাযোগের জন্যে এ পোর্ট ব্যবহার করা হয়।

বার কোড I Bar Code

কোনো দ্রব্য বা আচ্ছাদনের (Cover) গায়ে পাশাপাশি অনেকগুলো লম্ব রেখাকে 'বার কোড' (Bar Code) বলা হয়। এ বার কোড ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠ করে সংখ্যা সূচক সংকেত বা কোড পাওয়া যায়। সাধারণত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মূল্য ও অন্যান্য তথ্যের জন্যে বার কোড ব্যবহার করা হয়। বিদেশের সুপার মার্কেটে বিক্রিত প্রতিটি উৎপাদিত দ্রব্যে বার কোড মুদ্রিত থাকে। একটি স্ট্যান্ডার্ড বার কোড ফরসেট উৎপাদিত দ্রব্যের প্রস্তুতকারীর পরিচিতি সংখ্যা, উৎপাদন সংখ্যা এবং মূল্য নির্ধারণী সংকেত বহন করে। চেক আউট কাউন্টারের Optical স্ক্যানার বার কোডের মূল্য তালিকা পাঠ করে তা প্রদর্শন করে।

বার কোড রিডার। Bar Code Reader
বার কোড (Bar Code)-এ মুদ্রিত সঙ্কেত পাঠ করার যন্ত্রকে 'বার কোড রিডার' বলা হয়।

বাউড। Baud
কম্পিউটার বা ইন্টারফেস কার্ড থেকে প্রতি সেকেন্ডে তথ্য প্রেরণের পরিমাণ ও গতির একককে 'বাউড' বলা হয়। অনেক সময় প্রতি সেকেন্ড বিট-এর এককের সাথে Baud-এর একককে সমান ধরা হয়। সব সময়ের জন্যে বা সব ক্ষেত্রে এ হিসেব অবশ্য এক রকম হয় না বা প্রযোজ্য হয় না। তথ্য পারাপারের ক্ষেত্রে B.P.S.(Bauds Per Second) বলতে প্রতি সেকেন্ডে বাউড-এর হিসেবে তথ্য পারাপারের পরিমাণ বোঝানো হয়।

বাউড রেট। Baud Rate
Asynchronous কমিউনিকেশনস্ চ্যানেলের চালান করার দ্রুততার হারকে 'বাউড রেট' বলে। ব্যক্তিগত কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে বাউড রেট প্রায়ই মডেমের দ্রুততার সাথে আকস্মিক স্থান করে নয়ে।

ব্যান্ডউইডথ্। Bandwidth
'ব্যান্ডউইডথ' বলতে তথ্য প্রবাহ চ্যানেলের মাপ বোঝানো হয়। তথ্য প্রবাহের পরিমাণ পরিমাপ করা হয় সেকেন্ড প্রতি সাইকেল (Cycles Per Second) বা হার্টজ (Hertz) বা সেকেন্ডে প্রতি বিট (Bits Per Second) হিসেবে। তথ্য প্রবাহের পরিমাণ যতে বেশি হয়, ব্যান্ডউইডথ্ও ততো বেশি হয়ে থাকে।

বেসিক। BASIC
BASIC হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে বেশি আলোচিত উচ্চ স্তরের (High Level) প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বা প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা। Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে BASIC.

বেটা সফটওয়ার। Beta Software
কম্পিউটারের সফটওয়ার উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন সফটওয়্যারকে 'বেটা সফটওয়্যার' বলা হয়। এ পর্যায়ে ব্যাপক ব্যবহারকারী মহলের মধ্যে সফটওয়্যার বিতরণ করা হয়।

বেটা টেস্ট। Beta Test
নতুন তৈরি সফটওয়ারের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বলা হয় 'বেটা টেস্ট'। বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করার আগে এ পর্যায়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে

সফটওয়ার বিতরণ করা হয় এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ের সফটওয়্যারকে বলা হয় 'বেটা টেস্ট'।

বায়োস। BIOS

পূর্ণনাম **Basic Input-Output System.** আই.বি.এম. পিসি ও কম্পাটিবল কম্পিউটারের ROM-এ সন্নিবেশিত নির্দিষ্ট প্রোগ্রামকে বলা হয় BIOS. এ প্রোগ্রাম কম্পিউটার এবং ডিস্ক ড্রাইভ ও অন্যান্য যন্ত্রাদির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং নির্দেশাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আই.বি.এম. পার্সোনাল কম্পিউটার এক্সটি (XT) এটি(AT) এবং পি এস/২ (PS/2)-এ ব্যবহৃত বায়োস (BIOS)-এর স্বত্ব সংরক্ষিত (Copyrighted)। কম্প্যাক ও অন্যান্য কম্পাটিবল কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কম্পিউটারের জন্যে নিজস্ব বায়োস (BIOS) ব্যবহার করে থাকে, যা আই বি এম বায়োসের ইমুলেশন (Emulation)। কম্পাটিবল কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছে করলে নিজেরা বায়োস ইমুলেশন (BIOS Emulation) তৈরি করতে পারে বা অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করেও ব্যবহার করতে পারে।

বিগ ব্লু। Big Blue

আই.বি.এম. কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক রং হচ্ছে নীল (Blue) এ জন্যে আই.বি.এম-কে 'বিগ ব্লু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

বিট-ম্যাপ ফন্ট। Bit-Mapped Font

মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন এবং প্রিন্টারে মুদ্রণের জন্যে ডটের (Dots) তৈরি ফন্টকে 'বিটম্যাপ ফন্ট' বলা হয়। বিটম্যাপ ফন্ট ইচ্ছে মতো ছোট-বড় করা যায় না। বিটম্যাপ ফন্ট নিজস্ব আকারের চেয়ে বড় করলে ভেঙে যায় বা বিকৃত হয়ে যায়। বিটম্যাপ ফন্ট কম্পিউটার এবং প্রিন্টারের প্রচুর স্মৃতি দখল করে থাকে। কারণ, স্মৃতিতে বিটম্যাপ ফন্টের প্রতিটি সেট ভিন্ন ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। পক্ষান্তরে আউটলাইন ফন্ট তৈরি করা হয় গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে এবং আউটলাইন ফন্ট ইচ্ছেমতো ছোট বড় করা যায়। এ জন্যে আউটলাইন ফন্টকেই উন্নতমানের ফন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর তাই আউটলাইন ফন্ট প্রিন্ট করার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রিন্টারের দামও হয় বেশি।

বাইনেট। BINET

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের এক হাজারেরও বেশি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় একটি নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক-ই 'বাইনেট' নামে পরিচিত।

বাগ)। BUG

প্রোগ্রামিংয়ের ত্রুটিকে 'বাগ' বলা হয়। বাগের উপস্থিতির কারণে কম্পিউটার সিস্টেম ও প্রোগ্রাম এলোমেলোভাবে কাজ করতে পারে, ভুল ফল বা আউটপুট আসতে পারে, ইত্যাদি আরো নানা প্রকার অসুবিধে হতে পারে। বাগের কারণে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। চাঁদে প্রথম মানুষ অবতরণের মাত্র ৫ দিন আগে নাসা'র প্রোগ্রামে বাগ ধরা পড়ে। এ বাগের উপস্থিতিতে ভুল তথ্য প্রাপ্তির ফলে নভোচারীরা হয়তো আর কোনোদিনই পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারত না। সৌভাগ্য যে আগে-ভাগেই বাগ ধরা পড়েছিল এবং তা অপাসারণ করা হয়েছিল।

বেজিয়ার কার্ভ। Bezier Curve

উচ্চারণ 'bez'-ee-ay। একটি গাণিতিক উৎপাদন লাইন যা Non-uniform কার্ভ প্রদর্শন করে। ফরাসি গণিতবিদ Pierre Bezier-এর নামে Bezier curve-এর নামকরণ করা হয়। তিনিই প্রথম তাদের জমি বিশ্লেষণ করেছিলেন।

বাইনারি সিস্টেম। Binary System

কম্পিউটারের তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের কাজ সম্পাদিত হয় তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে। কম্পিউটারের মাদার বোর্ডে হাজার হাজার ইলেকট্রনিক সার্কিট রয়েছে। সার্কিটগুলো সুইচ পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সার্কিটগুলো দুটি মাত্র অবস্থায় থাকতে পারে, হয় বন্ধ না হয় চালু। বন্ধ হচ্ছে বিযুক্ত এবং চালু হচ্ছে যুক্ত। সুইচ বন্ধ (Off) থাকলে সার্কিট সম্পূর্ণ হয় না। সার্কিট সম্পূর্ণ না হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচল করতে পারে না। সুইচ চালু (On) থাকলে সার্কিট সম্পূর্ণ হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল করতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে (On) এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ নেই (Off), এই দুটি মাত্র শর্তে কম্পিউটার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এ জন্যে কম্পিউটারের সকল কাজের জন্যে বাইনারি পদ্ধতি (Binary System) ব্যবহার করা হয়।

বিট, বাইট। Bit,Byte

কম্পিউটার যাবতীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের কাজ করে বাইনারি পদ্ধতিতে। বাইনারি পদ্ধতিতে যাবতীয় গণনার কাজ করা হয় শূন্য (০) এবং এক (১) সংখ্যা ব্যবহার করে। কম্পিউটার বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকা অবস্থাকে এক (১) এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ অবস্থাকে শূন্য (০) হিসেবে ধরে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে থাকে। প্রতিটি শূন্য (০) এবং এক (১) কে একটি 'বাইনারি ডিজিট' (Binary Digit) বা 'বিট' (Bit) ধরা হয়। বিট হচ্ছে কম্পিউটারের তথ্য পরিমাপের সর্বনিম্ন

একক। ৮ বিটে হয় ১ বাইট (Byte)। প্রতিটি অক্ষর, সংখ্যা, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্ন গঠিত হয় ১ বাইটে (৮ বিট)। বাইটের পরবর্তী একক হচ্ছে 'কিলোবাইট'। ১০২৪ বাইটে হয় ১ কিলোবাইট। কিলোবাইট (Kilobyte) বোঝাতে সংক্ষেপে KB অথবা শুধু K লেখা হয়। কিলোবাইটের পরবর্তী একক হচ্ছে মেগাবাইট (Megabyte)। ১০২৪ কিলোবাইটে হয় ১ মেগাবাইট। মেগাবাইটকে সংক্ষেপে MB লেখা হয়। মেগাবইটের পরবর্তী একক হচ্ছে গিগাবাইট (Gigabyte)। ১০২৪ মেগাবাইটে হয় ১ গিগাবাইট। গিগাবাইটকে সংক্ষেপে GB লেখা হয়। কম্পিউটারের রম, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক ইত্যাদির ধারণ ক্ষমতা এবং স্মৃতির পরিমাণ বোঝানো হয় কিলোবাইট, মেগাবাইট গিগাবাইট ইত্যাদি এককের হিসেবে। একটি প্রোগ্রাম বা ডকুমেন্ট-এর আয়তন বোঝানোর জন্যে কিলোবাইট, মেগাবাইটের একক ব্যবহার করা হয়। যেমন: একটি ৮০০ কিলোবাইট প্রোগ্রামের চেয়ে ১০/১৫ মেগাবাইটের প্রোগ্রাম অনেক বড় আকারের প্রোগ্রাম। তেমনি ১০০ কিলোবাইটের একটি ডুকমেন্টের লিখিত বিষয়বস্তু এর চেয়ে ২০০ কিলোবাইটের ডকুমেন্টের আকার স্বাভাবিকভাবেই দ্বিগুণ বুঝতে হবে।

ব্লেসড ফোল্ডার। Blessed Folder

মেকিনটোশের একাধিক সিস্টেম ফোল্ডারের মধ্যে সক্রিয় সিস্টেম ফোল্ডারটিকে 'ব্লেসড ফোল্ডার' বলে।

বোল্ডফেস। Boldface

সাধারণ অক্ষরের তুলনায় মোটা অক্ষরকে 'বোল্ড' (Bold) টাইপ বা অক্ষর বলা হয়। 'বোল্ডফেস' বলতে মোট অক্ষরকেই বোঝানো হয়।

ব্রিজ। Bridge

দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেমকে সংযুক্ত করার যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্রিজ বলা হয়। ব্রিজের সাহায্যে সংযুক্ত করা নেটওয়ার্কিংয়ের একেকটি অংশকে বলা হয় 'জোন' (Zone) বা অঞ্চল।

বাল্ক স্টোরেজ। Bulk Storage

কম্পিউটারের তথ্য ধারণ বা সংরক্ষণ করার জন্যে তৈরি অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রকে 'বাল্ক স্টোরেজ' যন্ত্র বা 'ডিভাইস' বলা হয়। বাল্ক স্টোরেজ-এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে বিপুল মজুদ। বাল্ক স্টোরজ ডিভাইসের ধারণ ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় 'টেরাবাইট' (Terabyte) হিসেবে।

বান্ডলড সফটওয়্যার । Bundled Software

কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে একইমূল্যে যেসব সফটওয়্যার প্রদান করা হয় তাকে 'বান্ডলড সফটওয়্যার' বলে।

বাটন । Button

যদিও এর অর্থ বোতাম। এটি শার্ট প্যান্টের বোতাম নয়, সফটওয়্যারের ডায়লগ বক্সের বোতাম বা বাটন।

ক্যাবল । Cable

'ক্যাবল' অর্থ তার। সাধারণত বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের তারকেই 'ক্যাবল' বলা হয়। কম্পিউটারের সঙ্গে প্রিন্টার, মোডেম, মাউস, কী-বোর্ড, এক্সটারনাল হার্ড ডিস্ক, স্ক্যানার ইত্যাদি পেরিফেরাল ডিভাইসের সংযোগ দেওয়া এবং নেটওয়ার্কের জন্যে বিভিন্ন প্রকার ক্যাবল বা তার ব্যবহার করা হয়। সব ক্যাবল দিয়ে সব রকমের সংযোগ বা নেটওয়র্কের কাজ হয় না। নির্দিষ্ট সংযোগ ও নেটওয়ার্কের জন্যে নির্দিষ্ট ধরনের ক্যাবল (Cable) ব্যবহার করতে হয়।

ক্যাড । CAD

Computer Aided Design-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে CAD. CAD সফটওয়ার বা প্রোগ্রামের সাহায্যে স্থাপত্য ও যন্ত্রকৌশলসহ বিভিন্ন প্রকার বৃহৎ, জটিল ও সূক্ষ্ম নকশা প্রণয়নের কাজ করা হয়।

সিডি । CD

Compact Disk-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে CD (সিডি)। ফ্লপি ডিস্ক যেমন কম্পিউটারের ইন্টারনাল অথবা এক্সটারনাল ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভে ঢুকিয়ে কাজ করতে হয়, সিডি (CD)-কেও তেমনি কম্পিউটারের ইন্টারনাল অথবা এক্সটারনাল সিডি (CD) ড্রাইভে ঢুকিয়ে কাজ করতে হয়। সিডি'র আকার ৫ ইঞ্চি ফ্লপি ডিস্কের মতো হলেও একটু পুরো এবং দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্যই এর মূলকথা নয়। সিডি'র ধারণ শতাধিক ফ্লপি ডিস্ক-এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। যেমন : একটি সিডি (CD) বা 'কমপ্যাক্ট ডিস্ক' (Compact Disk)-এ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার সবগুলো ভল্যুম অনায়াসে ধারণ করতে পারে।

চিপ । Chip

একটি মাত্র সেমিকন্ডাকটিং বস্তু, সাধারণত সিলিকনে, একটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সার্কিট সন্নিবেশিত করে যে সমন্বিত সার্কিট (Integrated Circuit) তৈরি করা হয়

তাকেই 'চিপ' বলা হয়। সিলিকনে সন্নিবেশিত করা হয় বলে একে 'সিলিকন চিপ' বলেও উল্লেখ করা হয়।

ক্লায়েন্ট সার্ভার। Client Server

টাইম শেয়ারিং (Time Sharing) নেটওয়ার্ক এবং রিসোর্স শেয়ারিং (Resource Sharing) নেটওয়ার্ক পদ্ধতি দুটির সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধেগুলো দূর করে আরো অগ্রসর নেটওয়ার্ক পদ্ধতি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে 'ক্লায়েন্ট সার্ভার' নেটওয়ার্ক। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশন উভয় কম্পিউটারেই নিজস্ব CPU এবং Memory-এর সাহায্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজের সুযোগ রয়েছে। উভয় কম্পিউটারেই কাজ করা হয়। এ নেটওয়ার্কে সার্ভার হিসেবে মেইনফ্রেম, মিনিফ্রেম এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করা যেতে পারে। ওয়ার্ক স্টেশনগুলোকে সার্ভারের ক্লায়েন্ট (Client) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ নেটওয়ার্ক পদ্ধতিকে বলা হয় 'ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার' (Client Server Architecture)।

কোড। Code

কম্পিউটারের প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্যে ব্যবহৃত নির্দেশমালাকে 'কোড' বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কোড বা নির্দেশমালা বিন্যস্ত করা হয়।

কম্পাটিবল। Compatible

যে সব কম্পিউটারে কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়া যে প্রোগ্রামগুলো চলে এবং যে সব যান্ত্রিক সংযোগ দিয়ে কাজ করা যায়, সেই সব প্রোগ্রাম এবং যন্ত্রাদিকে ঐ কম্পিউটারের জন্যে 'কম্পাটিবল' বলা হয়।

কনফিগারেশন। Configuration

কোনো যন্ত্রের গঠন বিন্যাস বা সমন্বয়ের ধরনকে ঐ যন্ত্রের 'কনফিগারেশন' বলা হয়। যেমন : কম্পিউটারের মাদার বোর্ডের গঠন বিন্যাস। আবার বিভিন্ন হার্ডওয়্যারের সমন্বিত বিন্যাসকেও একসঙ্গে 'কনফিগারেশন' বলা হয়।

কনট্রোল কোড। Control Code

লেখালেখি বা টেক্সট ফাইলে কিছু সংকেত বা বর্ণ থাকে, যা মুদ্রিত হয় না। এ সব বর্ণ বা সংকেত প্রিন্টারে মুদ্রণের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্যে কাজ করে থাকে। এ সব সংকেত বা বর্ণকে 'কনট্রোল কোড' বলে। যেমন : এ সব সংকেত বা বর্ণের নির্দেশ অনুযায়ী প্রিন্টার মুদ্রিত অক্ষর বা শব্দের বোল্ড, ইটালিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে মুদ্রিত করে। কিন্তু এ কোডগুলো মুদ্রিত হয় না।

সি.পি.ইউ. । C.P.U.

Central Processing Unit-এ সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে C.P.U.। নামেই বোঝা যায়, কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে এই যন্ত্রাংশটি। স্থায়ী স্মৃতি (ROM), অস্থায়ী স্মৃতি (RAM), গাণিতিক যুক্তি (Arithmatic Logic Unit = ALU) সমন্বয়ে CPU বা 'কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট' গঠিত।

সি.আর.টি । CRT

Cathod Ray Tube-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে C.R.T। কম্পিউটারে কাজ করার সময় টেলিভিশনের পর্দার মতো ছোট পর্দায় কী কাজ করা হচ্ছে দেখা যায়। এ পর্দাকেই বলা হয় C.R.T. টেলিভিশনের পর্দাকেও C.R.T. বলা হয়। পর্দা বা C.R.T.-সহ পুরো বাক্সটিকে একত্রে বলা হয় 'মনিটর' (Monitor)।

ডি.এ.এস.ডি. । DASD

Direct Access Storage Device-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে D.A.S.D. কম্পিউটারের চুম্বকীয় (Magnetic) ডিস্ককেই ডি.এ.এস.ডি. (DASD) বলা হয়।

ডাটা । Data

যে কোনো প্রকার তথ্যকে 'ডাটা' বলা হয়। এটা সাধারণ লেখালেখি হতে পারে, হিসাব-নিকাশ হতে পারে, ছবি হতে পারে এবং নকশা হতে পারে। কম্পিউটারের প্রোগ্রাম ব্যবহার করে যে সব তথ্য গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ফলাফল প্রদান করা হয়, সে সব তথ্যই ডাটা হিসেবে বিবেচিত হয়। কম্পিউটার সর্বনিম্ন ১ বিট পর্যন্ত তথ্য বুঝতে পারে। ১ বিট হচ্ছে একটি অক্ষরের ৮ ভাগের ১ ভাগ। অর্থাৎ ৮ বিট তথ্য দিয়ে তৈরি হয় একটি অক্ষর। ৮ বিটে হয় ১ বাইট।

ডিবেজ । dBase

আই.বি.এম. পিসি'র একটি জনপ্রিয় ডাটাবেজ প্রোগ্রাম। Ashton-Tate ১৯৮১ খ্রি. dBase বাজারজাত করে। ১৯৮৪ খ্রি. dBase III এবং ১৯৮৬ খ্রি. dBase-III+ বাজারে আসে। এরই মাধ্যে dBase III-এর ক্লোন Aston-Tate-এর বাজার অনেকখানি দখল করে নেয়। Aston-Tate ১৯৮৮ খ্রি. আরো শক্তিশালী প্রোগ্রাম dBase IV বাজারজাত করেছে।

ডিবাগ । debug

কোনো প্রোগ্রামের ত্রুটি সনাক্ত করা ও সংশোধন করাকেই 'ডিবাগিং' (Debugging) বলা হয়। ত্রুটি সনাক্তকরণ ও সংশোধনের জন্যে প্রোগ্রামারদের

সুবিধার্থে প্রোগ্রামের কম্পাইলারে ইন্টারপ্রেটারে অন্তর্ভুক্ত ইউটিলিটি প্রোগ্রাম/ সফটওয়্যারকে বলা হয় 'ডিবাগার '(Debugger)।

ডেস্কটপ I Desktop

মেকিনটোশ কম্পিউটারের সুইচ অন (On) করার পর যে পর্দাটি ভেসে ওঠে সে পর্দাটিকেই 'ডেস্কটপ' (Desktop) বলা হয়। এ পর্দায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম, ফাইল, ফোল্ডার ইত্যাদির আইকোন (Icon) থাকে। আই.বি.এম. পিসি'তে উইন্ডোজ চালু করার পর যে পর্দাটি আসে সে পর্দাটিকেই ডেস্কটপ (Desktop) হিসেবে চেনা যায়। এ ডেস্কটপেও বিভিন্ন প্রকার প্রোগ্রামের ও অন্যান্য কাজের জন্যে নির্দিষ্ট আইকোন থাকে। ডেস্কটপকে ফাইন্ডারও বলা হয়। কারণ, ফাইন্ডার প্রোগ্রামই ডেস্কটপকে সক্রিয় করে প্রদর্শন করে। আই.বি.এম. পিসি'র উইন্ডোজ ৯৫ অপারেটিং সিস্টেমে ও কম্পিউটার চালু করার পর কাজ শুরুর প্রস্তুতি পরিবেশ হিসেবে ডেস্কটপ পর্দা আসে।

ডিস্ক I Disk

কম্পিউটারের কাজ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় 'ডিস্ক' (Disk)-এ। রেকর্ড প্লেয়ার বা গ্রামোফোনে যে ডিস্ক রেকর্ড ব্যবহার করা হয়, কম্পিউটারের ডিস্কও ঠিক তেমনি রেকর্ডের মতো। কিন্তু আকারে অনেক ছোট। গ্রামোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারের রেকর্ড বেশ বড় এবং শক্ত। কম্পিউটারের ডিস্ক আকারে ছোট এবং পাতলা ও নরম। কম্পিউটারের ডিস্কে তথ্য ধারণ করা হয় চুম্বকীয় পদ্ধতিতে (ফ্লপি ডিস্ক এবং হার্ড ডিস্ক) এবং লেজার বিম পদ্ধতি (সিডি)। কম্পিউটারের ডিস্ক ৩ প্রকার ; (১) ফ্লপি ডিস্ক, (২) হার্ড ডিস্ক এবং (৩) কম্প্যাক্ট ডিস্ক (সিডি)। ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ৮০০ কিলোবাইট থেকে প্রায় দেড় মেগাবাইট পর্যন্ত। হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা কম পক্ষে ১২০ মেগাবাইট থেকে কয়েক গিগাবাইট, টেরাবাইট এবং তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি হতে পারে। আগে ২০, ৪০, ৮০ মেগাবাইটের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হার্ডডিস্ক প্রচলিত ছিল। এখন ৮০ মেগাবাইট ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডডিস্কও খুব একটা ব্যবহৃত হয় না।

ডিস্ক বাফার I Disk Buffer

কম্পিউটারে কাজ করার সময় অপারেটিং সিস্টেম কোনো তথ্য সরাসরি ডিস্কে সংরক্ষণ করে না। RAM-এর কিছু অংশ ভিন্ন করে নেয় এবং এ অংশকে অস্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহার করে। RAM-এর অংশকেই বলা হয় 'ডিস্ক বাফার'। ডিস্কে সংরক্ষণ করার জন্যে সেভ (Save) কমান্ড দিলেই মাত্র Disk Buffer-এ অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত তথ্য ডিস্কে সংরক্ষিত হয়।

ডিস্ক ড্রাইভ। Disk Drive

কম্পিউটারে ডিস্ক ঢুকানোর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরকেই 'ডিস্ক ড্রাইভ' বলা হয়। ফ্লপি ডিস্ক ঢুকানোর জন্যে ডিস্ক ড্রাইভ ৫.২৫ ইঞ্চি এবং সাড়ে ৩ ইঞ্চি মাপের হয়ে থাকে। কম্পিউটারের সঙ্গেকার এ ডিস্ক ড্রাইভকে বলা হয় 'ইন্টারনাল ডিস্ক ড্রাইভ'। আবার কম্পিউটারের বাইরেও ডিস্ক ড্রাইভ থাকতে পারে। এ ড্রাইভকে ক্যাবলের সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযোগ দিতে হয়।

ই-মেইল। E-Mail

Electronic Mail-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে E-Mail. ই-মেইল (E-Mail) হচ্ছে চিঠিপত্র প্রতিবেদন, লেখা ইত্যাদি আদান-প্রদানের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ পদ্ধতি। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ একজনের সঙ্গে একজনের বা একজনের সঙ্গে নেওয়ার্কভুক্ত বহুজনের হতে পারে। ই-মেইল বার্তা ধারণ ও প্রেরণ (Store and Forward) পদ্ধতিতে কাজ করে। এ জন্যে টেলিফোনের মতো বার্তা গ্রাহক/প্রাপকের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। ই-মেইল নেটওয়ার্কের যে কোনো সদস্যের প্রেরিত বার্তা কেন্দ্রীয় সিস্টেমে ধারণ করা থাকে। অন্য সদস্যরা কেন্দ্রীয় সিস্টেমের ধারণ বাক্সের সঙ্গে সংযোগ সক্রিয় করে তার জন্যে নির্দিষ্ট বা প্রয়োজনীয় বার্তাটি গ্রহণ করতে পারেন। আবার কেন্দ্রীয় সিস্টেম থেকে প্রাপকের সিস্টেমে বার্তা প্রেরণ করাও হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সিস্টেম এ ক্ষেত্রে প্রধান ডাকঘরের ভূমিকা পালন করে থাকে। ই-মেইল সরকারি বা বেসরকারি উভয় প্রকার হতে পারে। নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Loeal Area Network = LAN)-এর মাধ্যমে ই-মেইল পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। আবার সরকারি বা বড় ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ই-মেইল সার্ভিসের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সেবা দান করা হয়ে থাকে।

ইন্ড ইউজার। End User

কম্পিউটারের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত ব্যক্তিকেই 'ইন্ড ইউজার' বলা হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কম্পিউটারের সাহায্যে ডাটা প্রেসেসিং বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উপকৃত ব্যক্তিদের কম্পিউটারের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। পার্সোনাল কম্পিউটারের প্রচলন ব্যাপকতর হওয়ার পর কম্পিউটারের সঙ্গে বেশির ভাগ ব্যবহারকারীর সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

এক্সেল। Excel

এক্সেল হচ্ছে মাইক্রোসফট করপোরেশনের তৈরি স্প্রেডসিট প্রোগ্রাম। এতে পেজ লেআউট প্রোগ্রামের কিছু বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেকিনটোশ এবং

আই.বি.এম. পিসি কম্পাটিবল কম্পিউটারের উইন্ডোজ পরিবেশে এক্সেল ব্যবহার করা যায়। এক্সেলে যে কোনো ধরনের টাইপ, শেডিং ও রঙ ব্যবহার করা যায় এবং ডেস্কটপ মানের মুদ্রণ নেওয়া যায়। এর সাহায্যে হিসাব নিকাশ, বার গ্রাফ, ইত্যাদি কাজ করা যায়।

এরগোনোমিক্স। Ergonomic

মানুষ (ব্যবহারী) এবং যন্ত্রের মধ্যে নিরাপদ ও বৈজ্ঞানিক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা প্রণয়নের বিদ্যাকে 'এরগোনোমিক্স' বলা হয়। অর্থাৎ এরগোনোমিক্স-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে মানুষ এবং যন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতার সাথে কর্ম সম্পাদনের অনুকূল হয়। এরগোনোমিক্স-কে কখনো 'Human Engineering' হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

ফাইল কনভারসন। File Conversion

এক প্রোগ্রামের ফাইল অন্য প্রোগ্রামে বা ফাইল ফরমেটে রূপান্তর করাকেই 'ফাইল কনভারসন' বলা হয়। ফাইল কনভারসন বা রূপান্তর করা হয় ফাইল কনভারসন ইউটিলিটি প্রোগ্রাম (File Conversion Utility Program)-এর সাহায্যে। এ প্রোগ্রামের সাহায্যে এক ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের ফাইল অন্য ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে, ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের ফাইল গ্রাফিক্স প্রোগ্রামের ফাইলে এক ধরনেব গ্রাফিক্স প্রোগ্রামের ফাইল অন্য ধরনের গ্রাফিক্স প্রোগ্রামের ফাইলে রূপান্তরিত করা যায়।

ফ্রিওয়ার। Freeware

স্বত্বসম্পন্ন (Copyrighted) যে সব প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়, কিন্তু মুনাফার জন্যে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় না, সে সব প্রোগ্রামকেই 'ফ্রিওয়ার' বলা হয়।

ফাইল। File

'ফাইল' না 'নথি' শব্দটি বহুল পরিচিত। অফিস-আদালতের বিভিন্ন কাজের বা বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন নামের ফাইলে বা নথিতে রাখা হয়। কম্পিউটারেও তেমনি কোনো কাজ করে সংরক্ষণ করতে হয় ফাইলে।

ফ্লপি ডিস্ক। Floppy Desk

ফ্লপি ডিস্ক সোয়া ৫ বা সালে ৩ বর্গইঞ্চির একটি প্লাস্টিকের চাকতির মতো দেখায়। ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ফ্লপি ডিস্ক আবার দু ধরনের হয়। সাধারণ ফ্লটি ডিস্কের ধারণ

ক্ষমতা ৬৪০/৭২০/৮০০ কিলোবাইট পর্যন্ত এবং হাই ডেনসিটি (High Density) ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ১.২/১.৪ মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিলোবাইটকে সংক্ষেপে কে.বি. (KB) বা শুধু 'কে' (K) লেখা হয়। যেমন: ৮০০ কিলোবাইটের জন্যে লেখা হয় ৮০০ কে (800K) মেগাবাইটকে সংক্ষেপে এম.বি. (MB) লেখা হয়।

হার্ডডিস্ক I Hard Disk

হার্ড ডিস্ক হচ্ছে অসংখ্য ফ্লপি ডিস্কের ক্ষমতা নিয়ে গঠিত একটি বড় আকারের ডিস্ক। কাজেই, হার্ড ডিস্ক ইচ্ছে মতো নাড়াচাড়া করা যায় না, প্রয়োজনও হয় না। হার্ড ডিস্ক কম্পিউটারের নিচে বা পাশে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসিয়ে রেখে কাজ করতে হয়। হার্ড ডিস্ক আবার কম্পিউটারের ভেতরেও থাকতে পারে। তখন এ হার্ড ডিস্ককে বলা হয় 'অভ্যন্তরীণ হার্ড ডিস্ক' বা 'ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক'। ফ্লপি ডিস্ক পকেটে ফেলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, প্যাকেটে ঢুকিয়ে তুলে রাখা যায়, এক কম্পিউটারে কাজ করে অন্য কম্পিউটারে নিয়ে সম্পাদনার কাজ করা যায়, যেখানে সুবিধে সেখান থেকেই প্রিন্ট নেওয়া যায়। কম্পিউটারের সঙ্গে হার্ড ডিস্কের সংযোগ থাকে ক্যাবল বা তারের মাধ্যমে। কিন্তু ফ্লপি ডিস্ক কম্পিউটারের ভেতরে ঢুকিয়ে বা বাইরে রাখা ড্রাইভে ঢুকিয়ে কাজ করতে হয়। কম্পিউটারের পর্দার নিচেই ডান দিকে ফ্লপি ডিস্ক ঢুকানোর প্রবেশ মুখ বা ডিকস্ ড্রাইভ (Disk Drive) থাকে।

ফন্ট I Font

বাংলা অ থেকে শুরু করে ঁ পর্যন্ত সকল বর্ণ ও যুক্তাক্ষরসহ বর্ণমালার একটি সম্পূর্ণ সেট এবং ইংরেজির A থেকে Z পর্যন্ত ছোট ও বড় হাতের বর্ণমালার একটি সম্পূর্ণ সেটকে বলা হয় 'ফন্ট'। সকল ভাষার বর্ণমালার সম্পূর্ণ সেটকেই ফন্ট বলা হয়। আকৃতি অনুযায়ী একেক সেট ফন্টকে একেক নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন : ইংরেজির Bookman, Times, Helvetica, Optima ও বাংলার সুতন্নী তন্বী, রিনকি ইত্যাদি নামের ফন্টগুলোর বর্ণমালার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। ব্যবহারকারীরা তাদের কাজের ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করতে পারেন এবং করে থাকেন।

গেটওয়ে I Gateway

দুটি ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক বা 'লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক' (Local Area Network = LAN)-এর সাথে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network = WAN) বা মাইক্রো কম্পিউটারের সাথে মেইনফ্রেম কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপনকারী যন্ত্রকে 'গেটওয়া' (Gateway) বলা হয়।

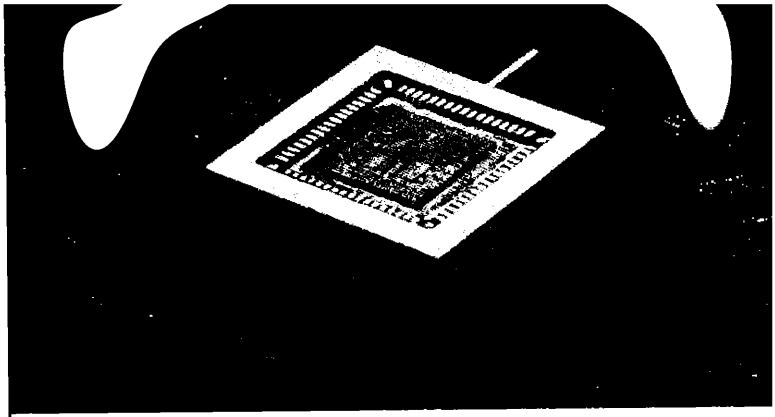

Parts of Processor - প্রসেসরের একাংশ

গিগাবাইট I Gigabyte

১ গিগাবাইট সমান হচ্ছে ১০০ কোটি বাইট (Byte), অর্থাৎ প্রায় ১,০৭৩, ৭৪১,৮২৪ বাইট বা ১,০০০ মেগাবাইট।

গ্রাফিক্স I Graphics

'গ্রাফিক্স' বলতে পার্সোনাল কম্পিউটারে তৈরি করা, পরিমার্জন করা ও মুদ্রিত গ্রাফিক্স ইমেজ বোঝায়। কম্পিউটারের গ্রাফিক্স প্রধানত দু প্রকার। প্রথমত 'অবজেক্ট অরিয়েন্টেড গ্রাফিক্স' (Object Orented Graphics) বা 'ভেক্টর গ্রাফিক্স' (Vector Graphics) এবং 'বিটম্যাপ গ্রাফিক্স' (Bit-Mapped Graphics) বা 'রাস্টার গ্রাফিক্স' (Raster Graphics)। 'অবজেক্ট অরিয়েন্টেড গ্রাফিক্স' (Object-Oriented Graphics) প্রোগ্রাম সাধারণত 'ড্র প্রোগ্রাম' (Draw Program) হিসেবে পরিচিত।

হার্ড কপি I Hard Copy

কম্পিউটারের কাজ প্রিন্টারের সাহায্যে মুদ্রণ নেওয়া হয়। এই মুদ্রিত কপিকেই 'হার্ড কপি' (Hard Copy) বলা হয়।

হার্ডওয়ার I Hardware

কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে 'হার্ডওয়্যার' বলা হয়। তা সে যত ছোট বা যত বড়ই হোক না কেন। কম্পিউটারের মাদার বোর্ড, পাওয়ার বোর্ড এবং এ সব বোর্ডে সংযোজিত সকল

যান্ত্রিক অংশ, মনিটর, প্রিন্টার, কী-বোর্ড, মাউস, ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, ক্যাবল, স্ক্যানার ইত্যাদি সব কিছুই হার্ডওয়্যার।

হার্ডওয়্যার হ্যান্ডসেক I Hardware Handshake

কম্পিউটারে তথ্য প্রেরণ শুরু এবং বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ার বিশেষ পদ্ধতিকে 'হার্ডওয়্যার হ্যান্ডসেক' বলা হয়। যেমন : অ্যাপল-এর ইমেজ রাইটার ২ প্রিন্টারে R.T.S. (Request To Send) লাইন লজিকের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ শুরু ও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তথ্য গ্রহণের বাফার (Input Buffer)-এর ক্ষমতার উপর এ লাইন লজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। এ পদ্ধতিকে 'Data Terminal Ready' প্রোটোকলও বলা হয়। XON এবং XOFF বর্ণসঙ্কেত প্রদানের মাধ্যমে কম্পিউটারে তথ্য প্রেরণ শুরু ও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র :

১. *Computer Education - John Lay, London.*
২. *History of Computer - W. Smith & Tomas Alion, U.S.A.*
৩. *Computer & Bill Gates - John Ann, Washington, U.S.A.*
৪. *Language of Computer - W. Canton, Ireland, U.K.*
৫. *History of Abacus - L. Alva, Germany.*
৬. *কম্পিউটার শব্দকোষ - মোস্তফা জব্বার, সিসটেক, ঢাকা*
৭. *কম্পিউটার এলো কেমন করে - আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা*
৮. *কম্পিউটারের মজার খেলা - হাসিবুর রহমান, ঢাকা*
৯. *কারেন্ট নলেজ মিলেনিয়াম - খায়রুল আলম মনির, ঢাকা*
১০. *কম্পিউটার : আধুনিক বিস্ময় - ভাষাবিন্যাস বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, ঢাকা*
১১. *কম্পিউটারের আত্মকথা - সাঈদ ইবনে জামান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
১২. *বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার - হাবিবুর রহমান, ঢাকা*
১৩. *কম্পিউটার এবং আলকুরআন - মাওলানা আলী আকবর খান, ঢাকা*
১৪. *একবিংশ শতাব্দী এবং কম্পিউটার - আলী আজগর, ঢাকা*
১৫. *সভ্যতা এবং কম্পিউটার - শ্রী অরবিন্দু ধর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
১৬. *ছোটদের বিশ্বকোষ - নচিকেতা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
১৭. *আজকের বিজ্ঞান - অনিমেষ পাল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

ISBN : 984701170127-1

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়